মহাবিজয়ের কাহিনী

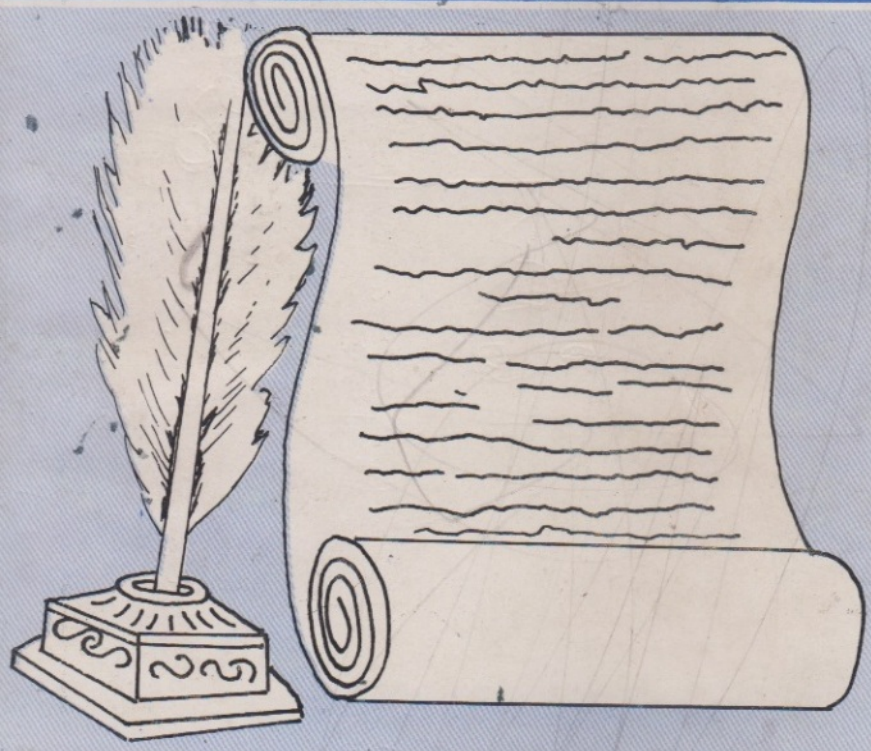

আজিজুল হক বান্না

মহাবিজয়ের কাহিনী

[যুব-কিশোর সিরিজ]

আজিজুল হক বান্না

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

মহাবিজয়ের কাহিনী (যুব-কিশোর সিরিজ)
আজিজুল হক বান্না

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৭৬৯
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭. ৭২
ISBN ঃ 984-06-0155-59

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯৩
আষাঢ় ১৪০০
যিলহজ্ব ১৪১৩

প্রকাশক
এম. আতাউর রহমান
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।

মুদ্রণ
এস. এস. প্রিন্টার্স
১০, নন্দলাল দত্ত লেন
লক্ষীবাজার, ঢাকা

বাঁধাই
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা
মূল্য ঃ ২৩.০০ টাকা মাত্র

MAHABIJOYER KAHINI [The History of Great Victory by Hazrat Muhammad (Sm)] : written by Azizul Hoque Banna in Bengali and published by Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka - 1000. June 1993

Price : Tk 23.00 ; US Dollar : 1.00

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

উষর মরুর রুক্ষ বুকে যে প্রদীপ্ত সূর্যরশ্মি বিকিরণ করেছিল আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে, বিদূরিত করেছিল অজ্ঞতা, অন্ধতা, অন্যায়-জুলুম আর অসত্য-অধর্মের প্রগাঢ় তমসা, তার নাম ইসলাম। আজ সারা দুনিয়ার কন্দরে কন্দরে সেই সূর্যের নূরানী দ্যুতি বিচ্ছুরিত; বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ সেই আলোয় খুঁজে পাচ্ছে সত্যপথের ঠিকানা।

তবে সূচনালগ্নে সেই আলোর নকীব হযরত মুহম্মদ (সা)-কে মুখোমুখি হতে হয়েছিল বহু বাধা-বিপত্তির। একদিকে ভালবাসার আর মমতার বাণী, অন্যদিকে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ—দুশমনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই। এভাবেই ইসলাম ক্রমান্বয়ে দাঁড়াতে থাকে শক্ত ভিতের ওপর। তারপর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে ইসলামের আলো। মানুষ সে-আলোর সমুদ্রে অবগাহন করে হয়েছে ধন্য, অর্জন করেছে পরম কামিয়াবী।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক আজিজুল হক বান্না 'মহাবিজয়ের কাহিনী' বইটিতে ইসলামের শত্রুদের সংগে মহানবী (সা)-র সশস্ত্র সংগ্রাম ও বিজয় অর্জনের কয়েকটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কাহিনীগুলো লেখক স্বচ্ছ-সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করে আমাদের কিশোর ও যুব শ্রেণীর মধ্যে ইসলাম-প্রীতি, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসচেতনতা জাগাবার প্রয়াস পেয়েছেন। আমরা আশা করি, লেখকের এই প্রয়াস ফলবতী হবে ইনশাআল্লাহ্। রহমানুর রহীম আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

দাউদ-উজ-জামান চৌধুরী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

পৃথিবীর মানুষ একটা অনির্দিষ্ট সীমিত সময়ের জন্য আসে আর চলে যায়। কুরআনের ভাষায় মানুষের এই আগমন আর প্রস্থান তার কর্মকাণ্ডের ভালমন্দ পরীক্ষার জন্য। তাই মানবেতিহাসে সত্য আর মিথ্যার দ্বন্দ্ব-লড়াই চিরন্তন। মিথ্যাচারীরা সত্যকে গ্রহণ না করলেও জগতে সব সময় সত্যেরই জয় হয়েছে। কারণ, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

মানব জাতির দিশারী সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনব্যাপী আপসহীন সংগ্রাম করেছিলেন মিথ্যার বিরুদ্ধে। তিনি সত্যের বিজয়কেতন উড্ডীন করে গেছেন নিজের জীবনে। এমনকি যে মানব জাতির কল্যাণে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ, তাদেরই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর মত সত্যিকার মানব বন্ধুর প্রাণের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল।

লেখক জনাব আজিজুল হক বান্না তাঁর 'মহাবিজয়ের কাহিনী' শীর্ষক বইতে মহানবীর সেই বিজয় কাহিনীর কতিপয় উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরেছেন বেশ সার্থকতার সাথে।

বিভ্রান্ত মানব সমাজ সত্যের আলো দেখে নিজ নিজ দুনিয়ার জীবন সার্থক করুক, আর তাতে বইটি কিছুটা অবদান রাখতে পারলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

এম. আতাউর রহমান
পরিচালক
প্রকাশনা বিভাগ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার আশা ও স্বপ্নের
পতাকা যারা বহন করবে
সেই সোনামণি
তৃপ্তি, মুক্তি ও মেহেদীর হাতে

www.pathagar.com

লেখকের কথা

'মহাবিজয়ের কাহিনী' যুব-কিশোর সিরিজের চতুর্থ বই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনী সমগ্রকে যুব-কিশোরদের মনের মতো ভাষায় উদ্দীপনা ও আবেগের অনুপান মিশিয়ে লিখতে চেষ্টা করেছি। এতে ইতিহাসের মূল সত্যকে অবিকৃত রেখে কাহিনী বিন্যাসে কিছুটা নিজস্ব ভংগী ব্যবহার করেছি। এর আগের লেখা যথাক্রমে 'ইসলামের প্রথম জিহাদ' ও 'মহাবিজয়ের পথে' ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবী জীবনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে যুব কিশোরদের কাছে গ্রহণীয় করে কয়েকটি বই উপস্থাপন করা। আমি ইসলামী বিপ্লবের তরুণ সহযোগীদের নবী-জীবনের সংগ্রামী চেতনা থেকে সরাসরি সবক নেবার প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিয়েই এই বই লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কবূল করুন।

পরিশেষে যাদের জন্যে এ বই লেখা, তাদের জন্যে নবী-জীবন একমাত্র দিকদর্শন হয়ে উঠুক, সে মুনাজাতই করি।

আজিজুল হক বান্না

www.pathagar.com

বিষয়সূচী

মহাবিজয়ের সেই সনদ	.....	.....	.....	০১
দিকে দিকে ছড়ালো সে পয়গাম	.....	.....	.....	০৬
আল্লাহ্‌র বিচার	.....	.....	.....	১৫
আর একটি ঐতিহাসিক পত্র	.....	.....	.....	১৭
ইহুদীদের সাথে আর একটি লড়াই	.....	.....	.....	২০
ইহুদী রমণীর শত্রুতা	.....	.....	.....	২৭
মুলতবি হজ্জ	.....	.....	.....	২৮
মুতা অভিযান	.....	.....	.....	৩১
দাস হলেন সিপাহসালার	.....	.....	.....	৩২
মক্কা অভিযান	.....	.....	.....	৩৫
মক্কা বিজয়ের পরে	.....	.....	.....	৪৩
হুনায়েন ও তায়েফ অভিযান	.....	.....	.....	৪৫
তায়েফের মাটিতে আরও রক্ত	.....	.....	.....	৫০
রোমানদের দর্প চূর্ণ	.....	.....	.....	৫৭
তাবুক বিজয়	.....	.....	.....	৬৩
খৃস্টানদের প্রতি উদারতা	.....	.....	.....	৬৫
বিদায় হজ্জের অমর বাণী	.....	.....	.....	৬৮

www.pathagar.com

মহাবিজয়ের সেই সনদ

হুদায়বিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর মহানবী (সা) সফলতার সুবহে সাদেক দেখতে পেলেন। এতকাল ধরে মক্কার ক্ষমতাগর্বী কুরাইশরা মুসলমানদেরকে কোন শক্তি হিসেবেই মনে করত না। যুগ যুগ ধরে কুরাইশরাই আরব দেশে একচ্ছত্র খবরদারি করে আসছিল। তারা কখনো অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে স্বীকার করে নেয়নি। তা ছাড়া কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় শক্তি কুরাইশদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে এগিয়েও আসেনি। ফলে, কুরাইশরা সবসময় নিজেদেরকে বিজয়ী বলেই ভাবত। এই ধারণা তাদের মাঝে অহমিকার জন্ম দিয়েছিল। তারা ভাবত, আরব জাতির উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার বুঝি তাদের একচেটিয়া। এই চিরস্থায়ী অধিকার খর্ব করার এখতিয়ার বুঝি কারো নেই।

কিন্তু কুরাইশদের এই ক্ষাত্রশক্তির অহমিকায় প্রথম আঘাত আসল বিশ্বমানবের চিরন্তন নেতা মহানবী (সা)-র তরফ থেকে। এ আঘাতের প্রথম প্রকাশ ছিল বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয়। তারও আগে প্রিয়নবী (সা) কলেমার বিপ্লবী দাওয়াত দিয়ে কুরাইশদের মিথ্যা বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানলেন। তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে ঘোষণা করলেন ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্—আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, মা'বুদ নেই, আইনদাতা নেই, রিযিকদাতা নেই, মুহম্মদ (সা) আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ!

কুরাইশদের চিরাচরিত অন্ধ বিশ্বাসের মূলে কলেমার বিপ্লবী পয়গাম প্রচণ্ড এক আঘাত হানল। কুরাইশরা দেখল, তাদের বাপ-দাদার নিজেদের রসম-রেওয়াজ, প্রথা-পার্বণ মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তাদেরই বংশের এক এতিম যুবক সম্পূর্ণ নতুন এক কথা বলে সাধারণ কুরাইশদের মাঝে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চাইছে। মুহম্মদ (সা) কুরাইশদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিপত্তি ছিনিয়ে নেবারও কোন অভিসন্ধি করেন নি। অথচ তিনি যে নতুন কথা বলছেন, তার শক্তি এত ব্যাপক, তার ক্ষমতা এতটা দুর্বার যে কুরাইশদের

www.pathagar.com

ধরে সৃষ্টির সেরা এ মানব সমাজ মানুষেরই দাসত্বের শৃংখলে বন্দী হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছিল। শক্তির দাপটে একদল মানুষ তাদের প্রবৃত্তি অবাধ্য স্বভাবের খেয়াল-খুশিমত আর একদল মানুষকে শোষণ করত। শান্তি ও বিচারের বাণী সেখানে নিভৃতে কাঁদত। জুলুম শোষণের নিগ্রহ গোটা মানবতাকে নিষ্ঠুরতায় বন্দী করে রাখত। সামাজিক নিপীড়ন ও রাজনৈতিক প্রভুত্বের যাঁতাকলে শান্তি পিয়াসী অসহায় মানুষ যখন কেঁদে বুক ভাসাত, ঠিক তখনই মহানবী (সা)-র আবির্ভাব।

তিনি নির্ভেজাল শান্তি প্রতিষ্ঠার আহবান জানালেন। নবুয়ত প্রাপ্তির আগে, যুবক মুহাম্মদ (সা)ও তাই শান্তি প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক কামনায় 'হিলফুল ফজল' বা শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন তদানীন্তন আরবেরই কিছু মুক্তমনের শান্তি পিয়াসী দুঃসাহসী যুবক।

যে মহামানবের জীবনের সাধনাই হচ্ছে, দুনিয়ায় শান্তির বাগান তৈরি করা, তিনি চারদিকে অশান্তি ও হানাহানির সয়লাব দেখে অস্থির হয়ে উঠে ছিলেন বোধশক্তি হবার পর থেকেই।

সমগ্র মক্কায় যখন কুরাইশ সরদারদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব চলছিল, বিচারফয়সালার দায়-দায়িত্বটাও যখন কুরাইশরাই পালন করছিল, তখন ঐ তল্লাটে যুবক মুহাম্মদ (সা) পরিচিত হন একজন সাচ্চা আমানতদার রূপে। মক্কার কট্টর কাফিররাও যুবক মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে তাদের অর্থসম্পদ গচ্ছিত রাখত নির্ভয়ে। তারা জানত, একমাত্র মুহাম্মদ (সা)-এর কাছেই তাদের ধন-সম্পত্তি নিরাপদ থাকতে পারে, অন্য কোথাও নয়। কাফিররা তাঁকে আল্ আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কিন্তু তারাই তাঁর প্রচারিত ইসলামের চরম বিরোধিতা করতে থাকে। অথচ কি আশ্চর্য, তা সত্ত্বেও মুসলমানদের নবীর কাছেই তারা অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখতে আসত। নবীও সে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কখনও বিরক্ত হননি। হাসিমুখে তিনি কাফিরদের ধন-সম্পদের আমানতদারী করেছেন। জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তিনি এই দায়িত্ববোধের কথা ভুলেন নি।

www.pathagar.com

কাফিরদের ভয়ংকর চক্রান্তের মুখে নবীজিকে যখন মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছিল, সেই কঠিন দুর্যোগের সময়ও তিনি আমানতদারীর দায়িত্ব এতটুকু বিস্মৃত হননি। রাতের আঁধারে কুরাইশদের সন্ধানী চোখকে ফাঁকি দিয়ে নবীজি সাথী আবূ বকর (রা)-কে নিয়ে মদীনায় চলে গেলেন। তিনি তাঁর শয্যায় রেখে গেলেন দুঃসাহসী বীর পুরুষ হযরত আলী (রা)-কে। তাঁর কাছে কুরাইশদের গচ্ছিত সমস্ত ধন-দৌলত বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনি ঐসব গচ্ছিত ধন-সম্পদ মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মদীনায় চলে গেলেন। এতবড় মহানুভবতা সততার উদাহরণ কোথাও মিলবে কি?

নবীজিকে এত কাছে থেকে দেখেও বিভ্রান্ত কুরাইশরা তাঁর সাথে চরম দুশমনি করত। নবীজি তো জীবনে কারও কোন ক্ষতি করেন নি। কারও মনে আঘাতও দেননি! চরম শত্রুর প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল মার্জিত ও মধুর। তাঁর চলার পথে যে কুরাইশ রমণীটি কাঁটা বিছিয়ে রাখত হররোজ তাঁকে কষ্ট দেবার জন্য, তিনি তার প্রতিও দয়ার্দ্র ও সদয় ছিলেন।

নবী তো এসেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য, আল্লাহ্‌র পয়গাম নিয়ে। তিনি তো আরবের বাদশাহ্ হতে আসেননি! কুরাইশরা তাঁকে বাদশাহী-সরদারির টোপ দিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। তিনি তাঁদের সাফ সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর এক হাতে সুরুজ আর অন্য হাতে চাঁদ এনে দিলেও তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ বন্ধ করবেন না।

ধুরন্ধর কুরাইশ সরদাররা বুঝতে পেরেছিল যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেশের শাসনভার না চাইলেও কর্তৃত্ব তাঁর হাতেই চলে যাবে। মক্কার কুরাইশরা, যারা হাতে গড়া নিশ্চল মূর্তির উপাসনা করত, আর কাবাঘরে রক্ষিত সেই মূর্তিগুলোর খাদেম হিসেবে কুরাইশদেরই প্রভুত্ব মেনে চলত, তাদের অনেকেই যখন মিথ্যা ধর্মের খোলস ছেড়ে ইসলামের শান্তির ছায়াতলে এসে ঠাঁই নিতে লাগল, কুরাইশ সরদারদের মাথা তখনই বিগড়ে গেল। তারা দেখল, মুসলমানদের কলেমা তাদের অস্ত্রের চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী। 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ আল্লাহ্‌র প্রেরিতে পুরুষ'— কলেমার এই বিপ্লবী বাণীর মধ্যেই নিহিত ছিল কুরাইশদের মৃত্যুবান। আররবাসীদের

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাম্রাজ্য। মহানবী (সা)-র সমসাময়িককালে ঐ সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন হিরাক্লিয়াস। ইনি বর্তমান তুরস্কের কনস্টান্টিনোপলে থেকে রাজ্য শাসন করতেন। তাঁকে 'কাইজার'ও বলা হত।

ঈসায়ী সপ্তম শতকে পারস্য সম্রাট খসরু রোমকদের পরাজিত করে মিসর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশ দখল করেন। কিন্তু হিরাক্লিয়াস পারসিকদের পরাজিত করে হৃতরাজ্যগুলোকে উদ্ধার করেন। ঠিক এই সময়ই হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিল।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি পারসিকদের পরাস্ত করে আবার ফিলিস্তিন অধিকার করতে পারলে পায়ে হেঁটে পবিত্র জেরুজালেম নগরীতে তীর্থ করতে যাবেন।

আগেই বলেছি যে, রোমানরা ছিল ধর্মে খৃস্টান, বিকৃত হলেও ঈসা (আ)-এর অনুসারী বলে তাঁরা নিজেদেরকে দাবি করত। আর সেই সুবাদেই তারা জেরুজালেমকে তীর্থ ক্ষেত্র মনে করত।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন জেরুজালেম অভিমুখে যাচ্ছিলেন, তখন একটি ঘটনা ঘটল। মহানবী (সা) সমসাময়িক দু'টি বিরাট সাম্রাজ্যের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং তার সর্বশেষ ফলাফল সম্পর্কে খবর রাখতেন। তিনি এই অবস্থার সুযোগ নেবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যখন খবর পেলেন যে, রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস জেরুজালেম অভিমুখে আসছেন, তখন তিনি তাঁর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেবার সুযোগ নিলেন।

পথিমধ্যে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের হাতে আরবী ভাষায় লিখিত একখানি পত্র এসে পৌঁছলো। বলা বাহুল্য, চিঠিখানি ছিল স্বয়ং আল্লাহ্‌র নবীর মোহরযুক্ত। চিঠিখানি নবী করীম (সা) দূত মারফত বসরার খৃস্টান শাসনকর্তা হারিসের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বসরার শাসনকর্তা একজন কর্মচারীকে ঐ দূতের সাথে দিয়ে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠিয়ে দেন।

চিঠিতে লেখা ছিল ঃ

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম—

আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের প্রধান পুরুষ হিরাক্লিয়াস সমীপে— সত্যের অনুসারীদিগের প্রতি সালাম। অতপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহবান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনার কল্যাণ হবে। ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ্‌ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু যদি এতে আপনি অস্বীকৃত হন, তাহলে আপনার প্রজাসাধারণের পাপের জন্য আপনি দায়ী হবেন।

কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি ঃ

"বল, হে গ্রন্থধারিগণ! এসো, আমরা ও তোমরা একযোগে সেই সাধারণ সত্যকে অবলম্বন করি ঃ আমরা কেউই আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকেও উপাসনা করব না এবং আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও অংশীদার করব না; অথবা নিজেদের মধ্য থেকে কাউকেও আল্লাহ্‌র আসনে বসাবো না। কিন্তু যদি তারা একথা না মানে, তবে বলে দাও যে, আমরা মুসলমান; তোমরা এ কথার সাক্ষী থেকো।"

— (৩ঃ ৬৩)

(মোহর) মুহাম্মদ, রাসূল আল্লাহ্‌

একজন প্রবল পরাক্রমশালী খৃস্টান নরপতির কাছে অশ্রুতপূর্ব উম্মি নবীর পত্র! আর চিঠির রচনাভঙ্গী, বর্ণনা কৌশল, অভিনব; বিষয় পারিপাট্য— সবকিছু মিলিয়ে অভিনব এক চিঠি। নিরেট সত্যের প্রতি উদাত্ত আহবানের এক নির্ভয় দলীল। সম্রাট হিরাক্লিয়াস এমন চিঠি কখনও দেখেন নি! রোমান খৃস্টানরা ভাবত, তারাই সত্যধর্মের অনুসারী। খৃস্ট ধর্মের বাইরেও যে অভ্রান্ত অকাট্য সার্বজনীন খোদায়ী ধর্মের অস্তিত্ব থাকতে পারে, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের তা জানা ছিল না। বিকৃত খৃষ্টধর্মের অহমিকায় গোটা খৃস্টান জগত বুঁদ হয়েছিল। তবে বাইবেলে একজন 'শেষ নবী' আসার কথাও তারা জানতো। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অহংকারী সভাসদগণ এই স্পর্ধার বিরুদ্ধে সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য সম্রাটকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সম্রাট তাতে কান দেননি। তিনি বরং আল্লাহ্‌র নবী সম্পর্কে জানার জন্য উদগ্রীব হলেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বসে, তাহলে মুসলমানদের শক্তি অনেক বেড়ে যাবে। তখন আর কুরাইশদের পক্ষে মুসলমানদের সাথে শক্তি পরীক্ষার মহড়া চালানো সম্ভব হবে না।

এদিকে হিরাক্লিয়াসের মনে ভাবান্তর হল। তাঁর অন্তরলোক থেকে কে যেন তাঁকে বলে দিচ্ছে যে, এই সেই মহামানব, যাঁর প্রতীক্ষায় এই নিখিল বিশ্ব অধীরভাবে প্রহর গুণছিল।

উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে সম্রাট হিরাক্লিয়াস বললেন ঃ ইনি যে নবী, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমাদের কথা থেকেই জানলাম যে, তিনি সদ্বংশজাত। নবীরা চিরদিনই সদ্বংশজাত হন।

তোমরা বলেছ, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কোনদিন রাজা ছিলেন না। এ থেকে বোঝা যায় যে, পূর্বপুরুষদের রাজত্ব উদ্ধারের জন্য ছলনা করে তাঁর নবী সাজার কোন কারণ নেই।

দীন-দরিদ্র লোকরাই যখন তাঁর ধর্ম কবূল করছে, তখন বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তাঁর ধর্ম সত্য ধর্ম। সকল সত্য ধর্মের বেলায়ই এমন ঘটে থাকে।

তোমরা বলছ যে, জীবনে তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই বা কারও সাথে কথা দিয়ে তা ভঙ্গও করেন নাই। এটাই নবীর লক্ষণ।

সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মনের গহীনে এক অব্যক্ত সত্য আজ ঠাঁই করে নিয়েছে। আর সেই অদৃশ্য শক্তি তাঁকে দিয়ে সত্যকথা বলাচ্ছে। তিনি যেন তাঁর উদ্‌গত অনুভূতি প্রকাশ না করে স্বস্তি পাচ্ছেন না। আবেগের আতিশয্যে তিনি অকপটে অনর্গল কথা বলছিলেন। মুহূর্তে যেন তিনি বিস্মৃত হয়ে গেলেন যে, তিনি পরাক্রমশালী রোমানদের সম্রাট!

তিনি বলতে লাগলেন ঃ "যিনি এ পর্যন্ত মানুষ সম্পর্কে কোন মিথ্যা কথা বলেন নি, তিনি হঠাৎ আল্লাহ্ সম্পর্কেই বা মিথ্যা কথা বলতে যাবেন কেন ? তাছাড়া তিনি মানুষকে তো কেবল মহৎ জীবন গড়ারই পরামর্শ দেন। কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, ইনিই সেই মহান শেষ নবী—পৃথিবী যাঁর প্রতীক্ষা করছে। আমার সুযোগ ও শক্তি থাকলে আমি সেই মহাপুরুষের কাছে পৌঁছে তাঁর পা ধুয়ে দিতাম।"

www.pathagar.com

হিরাক্লিয়াস এক নাগাড়ে এত কথা বলে কিছুটা থামলেন। সভাসদবর্গের দিকে ঔৎসুক্য নিয়ে তাকালেন। তিনি জানতেন, দরবারের সবাই বিশেষ করে খৃস্টান পাদ্রীরা তাঁর এই অকপট স্বীকৃতিতে সন্তুষ্ট হতে পারবেন না। কেননা প্রতিটি সত্যধর্মের আগমনই পুরনো জরাজীর্ণ বিকৃত ও অসম্পূর্ণ ধর্মের অবলুপ্তি কামনা করে। ইসলাম ধর্ম হিসেবে নতুন হলেও এটিই চিরন্তন ও শাশ্বত জীবন বিধান। ইহুদী-খৃস্টান-পারসিক-পীত-বাদামী— সকল মানবগোষ্ঠীর জন্যেই ইসলামের পয়গাম। কিন্তু প্রতিটি পুরনো ধর্ম আঁকড়ে ধরে যেসব পুরোহিত নিজেদের খবরদারি টিকিয়ে রাখতে চাইল, তারা সত্য জেনেও তা অস্বীকার করলো। কারণ এখানে কায়েমি স্বার্থ বিপন্ন হবার আশংকা ছিল।

পুরনো ধর্মের ধারকরা তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব হারাবার ভয়ে তাই শংকিত হলো। খৃস্টান পাদ্রীরা সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বক্তব্যে আরও শংকিত হলো। যেখানে রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র খৃস্ট ধর্মের বিজয়কেতন উড়ছিল, সেখানে সম্রাট যদি এই নতুন ধর্মমতটি গ্রহণ করে বসেন, তাহলে রাজ্যময় বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে। সম্রাট এদিকটা তাৎক্ষণিকভাবে ভেবে দেখেন নি। সভাস্থলে পাদ্রীদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। সম্রাট জানতেন, তিনি যত শক্তিশালীই হোন না কেন, এই ধর্মান্ধ খৃস্টান পাদ্রীরা ক্ষেপে গেলে আর না হোক রাজ্যময় অশান্তির আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে। গোটা খৃষ্টান জগত ক্ষেপে গেলে তাঁর পক্ষে টিকে থাকাই দায় হবে। কেননা তখনও খৃস্টান জগতে পাদ্রীদের প্রভাব ছিল অপ্রতিহত এবং চার্চের আশীর্বাদ নিয়েই সম্রাটদের রাজ্য শাসন করতে হত। সাম্রাজ্যের ভাবী বিপদ আঁচ করে সম্রাট তাড়াতাড়ি কূটনৈতিক মারপ্যাঁচের মাধ্যমে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। সকলে শান্ত হল। এভাবেই রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দোড়গোড়ায় ইসলামের দাওয়াত মাথা কুটে ফিরে গেল।

ঐ সময় যদি সম্রাট হিরাক্লিয়াস ইসলাম কবুল করতেন, তাহলে হয়ত পৃথিবীর ইতিহাসই বদলে যেত। যারা জহুরী তারা খাঁটি সোনা আর ভেজাল সোনা বাছাই করতে পারেন সহসাই। কিন্তু যারা এ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখে না, তারা আসল-নকলের পরীক্ষায় নকল নিয়েই মাতামাতি করে থাকে। খৃস্টান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কেন ? সম্রাট খসরু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে সাথে সাথে মহানবী (সা)-র চিঠিখানি টুকরা টুকরা করে ফেললেন। কিন্তু দাম্ভিক সম্রাট খসরু তখনও জানতেন না যে, আল্লাহ্‌র নবীকে অবজ্ঞা করার নির্মম পরিণতি তাকে বহন করতে হবে।

ঐ সময় ইয়ামনের শাসনকর্তা ছিলেন 'বাজান'। তিনি ছিলেন সম্রাট খসরুর অধীনস্থ শাসক। সম্রাট তাকে হুকুম দিলেন, মুহাম্মদ (সা)-কে অবিলম্বে গ্রেফতার করে যেন তার দরবারে পাঠানো হয়।

হুকুম তামিলে বাজান বিলম্ব করলেন না। তার ভয় ছিল সম্রাট নাখোশ হয়ে গেলে আবার তাকেই হয়তো বরখাস্ত হতে হয়। বাজান কালবিলম্ব না করে সম্রাটের আদেশক্রমে একটি গ্রেফতারী পরোয়ানাসহ দু'জন রাজ কর্মচারীকে মদীনায় নবীজির দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। কর্মচারী দু'জন যথাসময়ে হযরতের সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ সম্রাটের আদেশ পালন করুন, অন্যথায় তাঁর সেনাদল এসে আরব ভূমি দখল করে নেবে।

নবীজি সবই বুঝলেন। তবে রাজদূতদের কথায় খুব একটা আমল দিলেন না।

নবীজি তাদের বললেন ঃ আজ আমি কিছুই বলব না। কাল এসো, জবাব দেব।

পরদিন ঐ দু'ব্যক্তি নবীজির দরবারে পরোয়ানা নিয়ে হাজির হল।

মহানবী (সা) জানতে চাইলেন ঃ এ পরোয়ানা কে পাঠিয়েছে ?

এই অদ্ভুত প্রশ্নে আগন্তুক দূতদ্বয় একটু বিস্মিত হল। তারা একটু বিরক্ত হয়েই বলল ঃ কেন, সম্রাট খসরু!

হযরত বললেন ঃ "সম্রাটক খসরু ? তিনি তো জীবিত নাই! যাও তোমার প্রভুকে গিয়ে বল, খসরু যেমন করে আমার পত্রখানি টুকরা টুকরা করে ফেলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর রাজ্যকে ঠিক তেমনি করে টুকরা টুকরা করে ফেলবেন। দেখবে শীঘ্রই ইসলামের রাজ্য পারস্যের রাজধানী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।"

www.pathagar.com

কর্মচারীরা মহানবী (সা)-এর মুখে একথা শুনে হতবাক হয়ে গেল। তারা ভগ্ন মনোরথ হয়ে ইয়ামনে ফিরে চলল।

মহানবী (সা) তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ বাজানকে গিয়ে বলো সে যেন ইসলাম গ্রহণ করে। তাহলে আমি তাকে পূর্বপদে বহাল রাখব।

মহানবী (সা)-র এই বার্তা নিয়ে রাজকর্মচারী দু'জন তাদের প্রভুর কাছে ফিরে গেল। ইয়ামনে গিয়েই তারা একটি দুঃসংবাদ শুনতে গেল। তারা জানতে পারল যে, সম্রাট খসরু তার পুত্র নওশেরওয়া কর্তৃক নিহত হয়েছেন। আর ইয়ামনের শাসনকর্তা বাজানকে লিখে পাঠিয়েছেন যে, "সেই আরবীয় নবী সম্পর্কে দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন কোন কিছুই করা না হয়।"

রাজকর্মচারীদের মুখে ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা শুনে বাজান বিস্ময়ে, ভক্তিতে, বিনয়ে গলে গেলেন। তিনি দেখলেন, সম্রাট খসরুর মৃত্যুর ব্যাপারে নবীজি মদীনায় বসে যে কথা বলেছেন, তা যখন সত্য হয়েছে, তখন পারস্য সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তা-ও নিশ্চিতভাবেই সত্য হবে। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। বাজান ইয়ামনের শাসনকর্তার পদে বহাল থাকতে চান। আর তাই তিনি ইসলাম কবূল করে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁর অনুসরণ করে অনেক অগ্নি উপাসক পূর্ব-পুরুষের রসম রেওয়াজ পরিত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। এভাবে ইসলামের বিস্তার ক্রমশ বাড়তে থাকে।

মহানবী (সা) হুদায়বিয়ার শান্তি চুক্তির সুযোগ নিয়ে পুরো সময়টাই দাওয়াত ও প্রচারের কার্যক্রমে ব্যয় করতে থাকেন।

আর একটি ঐতিহাসিক পত্র

তৃতীয় পত্র প্রেরিত হল আবিসিনিয়ার খৃস্টান বাদশাহ্ নাজ্জাশীর কাছে। আবিসিনিয়া আফ্রিকা শৃঙ্গের একটি দেশ। বর্তমান নাম ইথিওপিয়া। এই বাদশাহ্ নাজ্জাশী নবীজির কাছে অপরিচিত নন। কিংবা নবীজিও বাদশাহ্ নাজ্জাশীর কাছে নন অজ্ঞাত।

www.pathagar.com

ইসলামের সূচনা পর্বে যখন মুসলমানদের প্রতিরোধের শক্তি ছিল খুবই ক্ষীণ, তখন নওমুসলমানদের উপর কুরাইশদের মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে হযরত (সা) বাদশাহ্ নাজ্জাশীর কাছে আশ্রয়ের জন্য দু'দল মুসলমান পাঠিয়েছিলেন। মুসলমানরা সত্য রক্ষায় এবং আল্লাহ্র রেজামন্দি হাসিলের জন্য নবীর নির্দেশে পৈতৃক ভিটেমাটি ছেড়ে সুদূর আবিসিনিয়ায় গিয়ে পড়ে রইলেন। সত্যের তরে এটাই মুসলমানদের প্রথম স্বদেশ ত্যাগ—হিজরত। বাদশাহ্ নাজ্জাশী ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ প্রজাবৎসল বাদশাহ্। তিনি ইসলাম কবূল না করলেও ইসলামের বিকাশ চেয়েছেন। তাঁর কোমল হৃদয়ে মজলুম মুসলমানদের প্রতি সীমাহীন দরদ ছিল। আর তাই মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় নিজেদের স্বদেশ ভূমির মতই নির্ভয়ে-নির্বিঘ্নে দিন কাটিয়েছেন। তাই বাদশাহ্ নাজ্জাশী সম্পর্কে মুসলমানদের মনে একটি মানবদরদী ব্যক্তিত্বের ছবি আঁকা ছিল।

এহেন মানবতাবাদী বাদশাহ্র প্রতি মহানবী (সা) এবার খোলাখুলি ইসলামের পতাকাতলে ঠাঁই নেবার আহবান জানালেন। কিন্তু দুভার্গ্য, নানা রাজনৈতিক কারণে বাদশাহ্ নাজ্জাশী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারেন নি। তবে তাঁর অপারকতার কথা তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে মহানবী (সা)-কে জানিয়েছেন।

এরপরও নবীজি তাঁর কাছে আর একটি পত্র দিয়েছেন। তবে তাতে আবিসিনিয়ায় অবস্থানকারী সর্বশেষ মুসলমান দলটিকে স্বদেশে ফেরত পাঠাবার অনুরোধ জানানো হয়। বাদশাহ্ নাজ্জাশী নিজ খরচে একখানি জাহাজে করে মুসলমানদের মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন।

আবিসিনিয়া থেকে এবার যেসব মুসলিম নর-নারী মদীনায় ফিরে এলেন, তাঁদের মধ্যে কুরাইশ কুল-শিরোমণি মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বী আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবাও ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ্ নামক জনৈক মুসলমান যুবকের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলেই আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা, তাঁর স্বামী সেখানেই ইহলোক ত্যাগ করেন। ফলে উম্মে হাবিবা এক প্রকার নিঃসঙ্গ ও নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

কি দুর্জয় সাহস ও ঈমানী চেতনা ছিল এই মহীয়সী নারীর। পিতা তৎকালীন আরবের ধনাঢ্য ব্যক্তি। অন্যদিকে কুরাইশদের নেতা। সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের হাতছানি এবং মা-বাবার মায়া ত্যাগ করে কেবলমাত্র সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা প্রমাণের জন্যেই আবূ সুফিয়ান তনয়া উম্মে হাবিবা সুদূর আবিসিনিয়ার কঠোর জীবন বেছে নিতেও কসুর করেন নি। কিন্তু সত্য-প্রীতির খেসারতও দিতে হয়েছে তাঁকে— স্বামীকে হারিয়ে। মদীনায় ফিরে এলেন তিনি এক বুক হাহাকার নিয়ে। দুঃখের দিনে যে স্বামীকে আঁকড়ে দিন কাটিয়েছেন, আজ সুখের সুবহে সাদিকের সময় সেই স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। মুশরিক মা-বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াবারও প্রশ্ন আসে না।

নবী (সা) উম্মে হাবিবার এই অসহায়ত্ব ও মনোকষ্টের কথা জানতেন। মানবদরদী নবী-হৃদয় সহানুভূতিতে উছলে উঠল। একদিকে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং অন্যদিকে ব্যথিত জনের প্রতি উদার মানবতাবোধ নবীকে ব্যাকুল করে তুললো। তিনি চাননি, তাঁর চরম দুশমন ইসলামী কাফিলার কোন সদস্য কিংবা সদস্যার অসহায়ত্ব নিয়ে কুরাইশরা কোন খোঁটা দিতে পারে।

আবূ সুফিয়ান মুশরিক হলেও তাঁর মুসলমান মেয়ের জন্য দরদ থাকা খুবই স্বাভাবিক। আর তাই তাঁর মতে মেয়ের কল্যাণ কামনা করে তিনি বারবার উম্মে হাবিবাকে ইসলাম থেকে খারিজ করে স্বীয় ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু একবার যারা ইসলামের স্বাদ পায়, তারা শত প্রলোভনেও ইসলাম ছাড়ে না। কিন্তু মুসলমান জামাতার মৃত্যুর পরে কন্যা উম্মে হাবিবা অসহায় জীবন কাটাতে থাকলে কুরাইশরা মুসলমানদের মানবতাবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারত। নবীজি কিন্তু কুরাইশদের সে সুযোগ দিলেন না। তিনি উম্মে হাবিবাকে আপন স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তাঁর ত্যাগের পুরস্কার দিলেন।

এতকাল যে দুর্ধর্ষ কুরাইশ শত্রুটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছায়ার মত লেগেছিলেন, সেই চরম দুশমনের কন্যাই এখন নবী-স্ত্রী! সম্পর্কের দিক দিয়ে এখন আবূ সুফিয়ান রাসূল (সা)-এর শ্বশুর! আবূ সুফিয়ানকে এভাবেই প্রেম ও প্রীতির পরশ দিয়ে হযরত বাঁধতে চাইলেন!

www.pathagar.com

মিসরের রোমান শাসক মুকাউসের কাছেও হযরত একইরূপ দাওয়াত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও রাজনৈতিক কারণে রাজধর্মের অর্গল মুক্ত হয়ে ইসলামের ডাকে সাড়া দিতে পারেন নি। তবে তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এই পত্রের জবাব দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বশ্যতা ও সৌহার্দ্যের নিদর্শন স্বরূপ মেরী ও শিরি নাম্নী দু'টি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া খৃষ্টান নারী ও একটি দুষ্প্রাপ্য শ্বেতবর্ণের অশ্ব উপহার পাঠিয়েছিলেন। হযরত মেরীর মত নিয়ে তাঁকে নিজ সহধর্মিণীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। শিরিকে কবি হাস্‌সানের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। নবীজি খৃষ্টানদের প্রতি মানবপ্রেমের হাত প্রসারিত করেন। এভাবেই তিনি সার্বজনীন প্রীতি ও বিশ্বপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। এভাবেই তিনি ঈসা নবীর অনুসারীদের সাথে মুসলমানদের চিরন্তন বন্ধনকে দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন।

বিবি মেরীর গর্ভেই হযরতের প্রথম পুত্র ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আল্লাহ্ এই ছেলেকে শৈশবেই তাঁর কাছে টেনে নেন। মুকাউসের দেয়া ঘোড়াটি হযরত অত্যন্ত আগ্রহভরে গ্রহণ করেছিলেন। এই ঘোড়ার নামই ছিল 'দুলদুল'। হযরতের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র ইমাম হোসেন এই দুলদুলই ব্যবহার করতেন।

এভাবে মহানবী (সা)-র নেতৃত্বে অলক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী এক বিপ্লবের কাঁপন সৃষ্টি হল। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সর্বত্র ইসলামের পয়গাম আলোড়ন সৃষ্ট করল। সমসাময়িক শাসকদের ক্ষমতায় মসনদ কেঁপে উঠল। সত্যি কথা বলতে কি, যুদ্ধ ছাড়াই শুধু দাওয়াতের মাধ্যমে এই স্বল্প সময়ে নবীজি অসাধ্য সাধন করলেন। সমসাময়িক বিশ্ব ইসলামের কাছে সরাসরি আত্মসমর্পণ না করলেও ইসলামের মুখোমুখি হয়ে তারা বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেল। এখান থেকেই বিশ্বব্যাপী ইসলামের নব-যাত্রার সূচনা হল।

ইহুদীদের সাথে আর একটি লড়াই

ইহুদীরা চিরদিনই বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। তারা স্বয়ং আল্লাহ্‌র সাথেই বার বার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। আর দুনিয়াতে যারা আল্লাহ্‌র হুকুম জারি করার প্রচেষ্টায় রত, ইহুদীরা পদে পদে আল্লাহ্‌র সেই সৈনিকদের অগ্রযাত্রায় বাধা দিচ্ছিল। আজও তাদের সে বদভ্যাস যায় নি।

www.pathagar.com

ইহুদীরা প্রাচীন জাতি। তাদের কাছে হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র ফরমান নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বাঁকা স্বভাবের ইহুদীরা অল্পদিনেই নবীর শিক্ষা ভুলে গিয়ে মনগড়া ব্যবস্থা মেনে চলতে থাকে। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তারা সুস্পষ্ট নির্দেশ ও নিদর্শন লাভ করেও আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরে যায়। সবচেয়ে বেশি দুশমনি করেছে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে। শেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে ইহুদীরা জঘন্য ষড়যন্ত্র চালাতেও কসুর করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ইহুদীদের এই খারাপ স্বভাবের কারণে 'অভিশপ্ত' বলে অভিহিত করেছেন।

ইহুদীরা মদীনায় নবীর বিরুদ্ধে শুরু থেকেই চক্রান্ত করছিল। মদীনায় নবীর নেতৃত্ব যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং মুসলমানদের শক্তি যাতে বাড়তে না পারে, সেজন্য ইহুদীরা মুসলমানদের দুশমনদের সাথে গোপনে ষড়যন্ত্র পাকাত। মুসলমানদের সাথে ইহুদীরা, ইতিপূর্বে সন্ধি করেও তা রাখে নি। বরং মুসলমানদের দুশমনের সাথেই হাত মিলিয়েছিল। এই চক্রান্তের শাস্তিস্বরূপ ইহুদীদেরকে মদীনা ছেড়ে জান বাঁচিয়ে চলে যেতে হয়েছিল। মদীনা থেকে বিতাড়িত বনি কাইনুকা ও বনি নাজির গোত্রের ইহুদীরা সিরিয়া ভূ-খন্ডের খায়বরে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। স্থানটি ছিল শস্যশ্যামল ও উর্বর। এ কারণেই অনেক আগে থেকেই সেখানে অন্যান্য ইহুদী বসতি স্থাপন করেছিল। স্থানটি অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। সেখানে প্রতিপক্ষের হামলা প্রতিরোধের জন্য বেশ কিছু সুরক্ষিত দুর্গ ছিল।

কুটিল স্বভাবের কারণে ইহুদীদেরকে যাযাবরের মত স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরতে হয়। তাদের স্বভাবদোষ এতটুকু বদলায় নি। মদীনা থেকে বিতাড়িত হবার প্রতিহিংসায় তারা ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল। খায়বরে এসে স্বজাতির লোকদের সাথে মিলে তাদের দুশমনিটা আরও বেড়ে গেল। মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং ইসলামের সম্প্রসারণের খবর তারা রাখত। তাদের মনে ভয়, ইসলাম যেভাবে প্রসারিত হচ্ছে, তাতে হয়ত তাদের খবরদারি আর টিকবে না।

তবে ইহুদীরা স্বভাবে যেমন বাঁকা তেমনি তারা কূটকৌশলেও সিদ্ধহস্ত। মুসলমানদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লড়ার শক্তি যে তাদের নেই, সেটা তারা ভাল করেই জানত। আর তাই মক্কার কুরাইশদের উস্কানি দিয়ে তারা মুসলমানদের

www.pathagar.com

সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের ফন্দি আঁটছিল। দু'পক্ষের যে কেউই যুদ্ধে হীনবল হলে ইহুদীদের রাজনৈতিক অভিলাষ চরিতার্থ করা সহজ হবে। এই সাধারণ কথাটি তাদের বোঝার মত বুদ্ধি ছিল।

ইহুদী নেতারা সভা করে তখনকার রাজনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন করল। তারা হিসেব কষে দেখল যে, খন্দক যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের ধকল তারা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। যুদ্ধের মাধ্যমে কুরাইশদের শক্তিহীনতাই প্রমাণ হয়েছে। ফলে খুব সহসা কুরাইশদের পক্ষে হয়ত মদীনা আক্রমণের কোন সুযোগ হবে না। অবশ্য শক্তি বিন্যাসে মুসলমানদের অবস্থাও খুব ভাল নয়। কেননা ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদেরও যথেষ্ট শক্তিক্ষয় হয়েছিল। সে অবস্থা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই মুসলমানদেরকে খন্দকের যুদ্ধে মুকাবিলা করতে হয়েছিল। সুতরাং স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মুসলমান বাহিনী পুনর্গঠন করাও সম্ভবপর হয়নি। এই নাজুক সময়টিকেই ইহুদীরা বেছে নিল। হয়ত আঘাত হানতে পারলে সহজেই মুসলমানরা পর্যুদস্ত হবে, এই প্রত্যাশায় ইহুদীরা চক্রান্তের নীল নকশা তৈরি করে ফেলল।

খায়বরের সব ইহুদী এক হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হতে লাগল। তারা গোপনে মদীনা আক্রমণের সব ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত করে ফেলল। মদীনার মোনাফিক ছদ্মবেশী দুশমনরাও ইহুদীদের সাথে হাত মিলালো।

এরপর থেকেই ইহুদীদের উস্কানিমূলক তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। মুসলমানদের বাণিজ্য কাফেলার উপর অতর্কিত হামলা চলতে লাগল। এভাবে বেশ কিছু নিরপরাধ মুসলমানের রক্তে ইহুদীদের খঞ্জর রঞ্জিত হল। মুসলমানদের মাল-সামানও তারা কেড়ে নিতে লাগল। এভাবে ইহুদীদের ঔদ্ধত্য দিন দিন বাড়তে থাকে।

এসব দুঃসংবাদ মদীনায় নবীজির কাছে পৌঁছল। নবীজিও ইহুদীদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবছিলেন। সাধারণ মুসলমানদের ধৈর্যের বাঁধও ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

তবে ইহুদীদের আর একটি হামলা মুসলমানদের ধৈর্যের প্রাচীর ভেঙ্গে দেয়। ইহুদী দুর্বৃত্তরা মদীনা সীমান্তে এসে মুসলমানদের কিছু উট ও এক মুসলিম নারীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

ইহুদীদের এই উৎপাত বন্ধ করার জন্য মহানবী (সা) জায়েদের নেতৃত্বে ওয়াদিল কোরা অভিযান এবং হযরত আলীর নেতৃত্বে 'ফদক' অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহুদীদের মনে তাতে কোন ভয়ের সঞ্চার হল না। তাদের দুরভিসন্ধি আরও বেড়ে গেল।

ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে সম্মুখ সমরে মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হল। তারা আসির নামক জনৈক ব্যক্তিকে তাদের নেতা নির্বাচিত করল। এবার তারা প্রকাশ্যেই বলতে লাগল ঃ "এতদিন আমরা মুহম্মদ সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করেছিলাম, আজ হতে তা পরিত্যাগ করলাম। মদীনা আক্রমণই হবে এখন আমাদের লক্ষ্য।"

ইহুদীদের এই সাজ সাজ রব মদীনায় পৌঁছে গেল। মুসলমানদের মধ্যে নতুন করে আবার জিহাদের উদ্দীপনা সঞ্চার হল। দুশমনদের উপর্যুপরি হামলার মুখে বিশ্রামের সুযোগ কই? আল্লাহ্‌র রাহে জীবনকে বিলিয়ে দেবার জন্য মুসলমানরা আবার তৈরি হতে লাগল। আল্লাহ্‌র দুশমনদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জিহাদ করা অবশ্য কর্তব্য।

মুসলমানদের সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। এবার চৌদ্দশ পদাতিক এবং দু'শ অশ্বরোহীর এক বাহিনী ইহুদীদের মুকাবিলার জন্য রওয়ানা হল। মুখে তাদের কলেমার ইনকিলাবী জোশ, হাতে নাঙ্গা তলোয়ার। তারা ছুটে চলছে অকুতোভয়ে। 'জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য' করে এগিয়ে চলছে।

মদীনা থেকে খায়বর দীর্ঘ প্রায় একশ মাইলের পথ। এই দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে যে সময় লাগার কথা, এবারে তার অনেক কম সময় লাগল। হযরত এত ঝড়ের বেগে তাঁর সেনাদল নিয়ে খায়বরে এসে ছাউনি গাড়লেন যে, ইহুদীরা কিছু টেরই করতে পারল না। খায়বরের কৃষকরা সকাল বেলা মাঠে কাজ করতে এসে দেখল সামনেই বিকট মুসলিম সেনাদল। তারা মাঠে কাজ না করেই ইহুদী নেতাদের কাছে খবর পৌঁছালো।

www.pathagar.com

ইহুদীরা দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে পড়ল। তারা ভেবেছিল, অপ্রস্তুত অবস্থায় অকস্মাৎ মদীনার মুসলমানদের উপর হামলা চালাবে। ফলে মুসলমানরা তাদের আকস্মিক হামলার মুখে নিশ্চিতভাবেই পরাজিত হবে। আর মদীনার মোনাফিক, গাতফান গোত্রের সাথে তাঁদের গোপন আঁতাত তো রয়েছেই। তারা যুদ্ধের সময় ভেতর থেকে অন্তর্ঘাতী তৎপরতা চালিয়ে মুসলমানদের হীনবল করে দেবে। কিন্তু ইহুদীদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। মুসলমানদের বর্তমান জঙ্গী ভূমিকা তাদেরকে নিরাশ করল। তারা ভাবতেই পারেনি যে, এতগুলো যুদ্ধ করে মুসলমানরা এই মুহূর্তে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসবে।

ইহুদীরা এখনও মুসলমানদের পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ বলেই এমন ধারণা করেছিল। মুসলমানদের কাছে পার্থিব জীবন যে তুচ্ছ মাত্র, তারা যে আল্লাহ্‌র রাহে জীবন বিলিয়ে দেয়াকে মহান ইবাদত বলে মনে করে, এ সত্য ইহুদীরা অনুভব্ করতে পারে নি। ইসলামের জিহাদ ও সাধারণ যুদ্ধ যে এক নয়, এটাও তারা উপলব্ধি করতে পারে নি।

মুসলমানদের শক্তি কিংবা শৌর্যবীর্য দেখিয়ে কাউকে হতবাক করে দেবার কোন অভিপ্রায় ছিল না। অথবা অন্যায়ভাবে দুর্বলকে পরাস্ত করে নিজেদের রাজ্যসীমা বিস্তৃত করারও কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল না। তাঁদের মূল কাজ তো সত্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। মদীনায় আল্লাহ্‌র নবীর নেতৃত্বে মুসলমানরা আল্লাহ্‌র রাজ প্রতিষ্ঠার যে অভিযান চালাচ্ছিল, শয়তানের দোসর ইহুদীদের তাতে গাত্রদাহ শুরু হয়। আর একারণেই তারা ইসলামের সূচনাপর্ব থেকেই মুসলমানদের সাথে চরম দুশমনি করতে থাকে। ইহুদীদের এই মজ্জাগত কু-স্বভাবটাকে সোজা করার জন্যই আল্লাহ্‌র নবী সশস্ত্র অবস্থায় আজ খায়বর প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছেন। মুসলমানরা কারও সাথে কোনদিন গায়ে পড়ে ঝগড়া বিবাদ করে না। ইহুদীদের সাথে খায়বরে মুকাবিলা করার জন্য মুসলমানদের এই যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পূর্ণভাবেই ইহুদীদের উস্কানির ফল। আর এ যুদ্ধটা মুসলমানদের দিক থেকে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ও আত্মরক্ষামূলক।

ইহুদীরা ভাবল, মুসলমানরা যখন মদীনা ছেড়ে সুদূর খায়বরে তাদের মুকাবিলা করার জন্য এসেছে তখন তারা প্রয়োজনীয় শক্তি নিয়েই এসেছে। এ মুহূর্তে মুসলমানদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লড়াই করার বিপদ সম্পর্কে ইহুদীরা

www.pathagar.com

সচেতনই ছিল। অহেতুক বিপদের ঝুঁকি নিতেও তারা সাহসী হল না। বিশেষ করে মুসলমানদের আকস্মিক আগমনের পটভূমিতে তাদের প্রস্তুতি তাতে খুবই নগণ্য হবে।

ইহুদী দলপতিদের মধ্যে সলা-পরামর্শ হল। ঠিক হল, তারা সুরক্ষিত দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিবে। তাহলে মুসলমানরা তাদের নাগাল পাবে না। ফলে ধৈর্যহারা হয়ে মুসলমানরা ফিরে যাবে। যে কথা সেই কাজ। ইহুদীরা সবাই সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল।

মুসলমানরা কখনও অহেতুক রক্তক্ষয় পছন্দ করে না। তাই শেষবারের মত চেষ্টা করলেন নবী। যাতে একটা সন্ধি করা যায়। কিন্তু মুসলমানদের তরফ থেকে সন্ধির প্রস্তাব গেলে ইহুদীরা তার ভুল অর্থ করল। তারা ভাবল, প্রথম চোটেই আক্রমণ না করে মুসলমানরা যখন সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই মুসলমানরা দুর্বল। ফলে এবারে তারা কিছুটা শক্ত হয়েই সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল।

হযরত এবার মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ শুরু করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হলেন। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায়ই ইহুদীদের নায়েন দুর্গটি মুসলমানদের দখলে এসে গেল। আরও কয়েকটি ছোট-খাটো দুর্গ ও গ্রাম খুব সহজেই মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হল। এরপর বাকি থাকল বিখ্যাত 'কামুস' দুর্গ। দুর্গটি বেশ সুরক্ষিত ছিল। একারণেই সেরা ইহুদী পাহলোয়ান ও নেতৃবৃন্দ এই দুর্গে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছিল। এই দুর্গটি অধিকার করতে না পারলে ইহুদীদের দম্ভ চূর্ণ হবে না, এটা মুসলমানরা খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন।

মুসলমান সৈনিকরা এবার সেই 'কামুস' দুর্গটি অবরোধ করে বসলেন। ইহুদীরা দেখল, মুসলমানরা কোনমতেই তাদের ছাড়বে না। দুর্গ-মধ্যেই বা তারা কতকাল থাকবে? ক্রমে তাদের মজুদ খাদ্য ও রসদ ফুরিয়ে আসছিল। তারা দেখল, এভাবে থাকলে তাদের না খেয়েই মরতে হবে।

ইহুদীদের মধ্যে দু'চারজন বীরপুরুষ ছিল। তারা এই অপমানকর অবরোধে খুব জ্বলছিল। ইহুদী বীর মোরাহ্হাব দুর্গের বাইরে এসে মুসলমানদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহবান করল। হযরতের অনুমতিক্রমে আমের নামক জনৈক সাহাবী এই

www.pathagar.com

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি নিজেই নিজের তরবারির আঘাতে আহত হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর মাসলামা নামক অপর মুসলিম বীর মোরাহ্হাবকে আক্রমণ করলেন। এবার মোরাহ্হাব আহত হল মারাত্মকভাবে। বীর কেশরী হযরত আলীর তরবারির আঘাতে মোরাহ্হাবের জীবনলীলা সাঙ্গ হল।

মোরাহ্হাবের এই শোচনীয় পরিণতি দেখে তার ভাই মুসলমানদের একইভাবে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসল। মুসলিম বীর জুবায়েরের হাতে তারও দম্ভ চূর্ণ হল। সে-ও অতপর মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারালো।

এরপর পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হল। প্রথম দিনের যুদ্ধের সিপাহসালার হলেন হযরত আবূ বকর (রা)। দ্বিতীয় দিনে নেতৃত্ব দেন হযরত উমর (রা)। উপর্যুপরি দু'দিনের হামলায় ইহুদীরা যথেষ্ট নাকানি-চুবানি খেল বটে। কিন্তু তাতে দুর্গের পতন ঘটল না।

তৃতীয় দিনের ঘটনা। এবার যুদ্ধের সিপাহসালারের দায়িত্ব ন্যস্ত হল বীর কেশরী শের-এ-খোদা আলীর উপর। হযরত আলীর ক্ষিপ্রতা, সাহস ও অসীম শক্তিমত্তার মুখে 'কামুস' দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ধসে পড়ল। দুর্গের পতন হল।

যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ১৯ জন শহীদ হন। আর ইহুদীদের দিকে নিহতের সংখ্যা ছিল ৯২ জন।

প্রায় তিন সপ্তাহকাল অবরুদ্ধ থাকার পর খায়বারের সমস্ত দুর্গের পতন ঘটে। ইহুদীরা উপায়ান্তর না দেখে হযরতের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

ইহুদীদের হাতের মুঠোয় পেয়েও হযরত তাদের জবরদস্তি ধর্মান্তরিত করেন নি। কিংবা তাদের সকলকে 'কতল'ও করেন নি। এতবড় জঘন্য দুশমনকে হাতে পেয়ে কেউ হিংস্রতা ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার বদলে শান্তির চুক্তি করেছে, এমন নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে আছে কি? প্রেম, দয়া ও মহত্ত্বের এই চরম পরাকাষ্ঠা ইসলামের নবীর পক্ষেই দেখানো সম্ভবপর হয়েছে।

হযরত আত্মসমর্পিত ইহুদীদের সাথে সন্ধি করলেন। সন্ধির শর্ত হিসেবে ঠিক হলো ঃ

www.pathagar.com

ক. ইহুদীরা আগের মতই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে। কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না।

খ. মুসলমানদের ন্যায় তাদের জিহাদে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হবে না।

গ. তাদের বাড়িঘর ও ধনসম্পত্তি আগের মতই তাদের স্বত্বাধিকারে থাকবে। তবে এখন থেকে তাদের সমস্ত ভূ-সম্পত্তি মদীনার ইসলামী সরকারের অধিকারভুক্ত হবে।

ঘ. উৎপন্ন শস্যাদির অর্ধেক রাজস্বস্বরূপ মদীনায় পাঠাতে হবে।

ঙ. অন্য কোন কর তাদের আর বহন করতে হবে না।

ইহুদী রমণীর শত্রুতা

ইহুদীদের প্রতি মহানবী (সা) সীমাহীন উদারতা প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাঁর রাসূল (সা)-এর নির্দেশ মেনে নেবার জন্য তাদেরকে তিনি অনেক নসিহত করেছেন। কিন্তু তারা কখনও তাদের কু-মতলব পরিত্যাগ করে সোজা পথে এগিয়ে আসেনি। জয়নব নামের এক ইহুদী রমণী মনে মনে মহানবী (সা)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। সে একদিন মহানবী (সা)-কে দাওয়াত করল। নবীজি দাওয়াত কবুল করলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীকেও তাঁর সাথে দাওয়াত করা হলো। ইহুদী মহিলা ভালো করে গোশ্‌ত রান্না করে মহানবী (সা)-এর সামনে এনে খাবার জন্য অনুরোধ করলো। এক টুকরা গোশ্‌ত মুখে দিয়েই নবীজি বুঝতে পারলেন যে, গোশ্‌তে বিষ মিশানো হয়েছে। তিনি চিৎকার করে বললেন ঃ 'সাবধান, এই গোশত কেউ খেয়ো না, এতে বিষ মিশানো আছে।'

বশর নামের জনৈক সাহাবী এর আগেই খানিকটা গোশ্‌ত খেয়ে ফেলেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি বিষের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ইন্তেকাল করলেন। আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে মহানবী (সা) রক্ষা পেলেন।

ষড়যন্ত্রকারী ইহুদী মহিলাকে ডাকা হলো। সে নিজের অপরাধ স্বীকার করলো। সে বললো ঃ আমি ইচ্ছা করেই একাজ করেছি। মুহাম্মদ, আপনার

www.pathagar.com

কারণে আমার পিতা, চাচা এবং স্বামী যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। আপনি নিজেকে পয়গম্বর বলে দাবি করাতেই আমাদের এই সর্বনাশ ঘটেছে। আমার সাধ ছিল আপনাকে একবার পরীক্ষা করব। আপনি যদি সত্যিই পয়গম্বর হন, তবে তো পূর্ব থেকেই বিষের কথা জানতে পেরে বিষাক্ত গোশ্‌ত খাবেন না, আর যদি আপনি পয়গম্বরের মিথ্যা দাবিদার হন, তবে নিশ্চয়ই আপনি ঐ গোশ্‌ত খাবেন এবং তাতে আপনার মৃত্যু ঘটবে। তখন আমরাও আপনার জ্বালাতন হতে রেহাই পাবো। এই ছিল আমার ইচ্ছা। এখন দেখছি আপনি পয়গম্বর নন, আপনি ভন্ড। কারণ খাদ্যে যে বিষ মিশানো আছে, তা তো জানতে পারলেন না! আপনার মৃত্যু অনিবার্য!

হযরত (সা) হাসিমুখে বললেন ঃ "জয়নব, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থাকলে বিষ খেয়েও আমি বাঁচতে পারি। কই আমি তো মরিনি।"

জয়নব নিজের চোখেই দেখল যে, বশর বিষ মিশানো গোশ্‌ত খেয়ে সাথে সাথেই মারা গেছেন। কিন্তু একই গোশ্‌ত খেয়ে মুহাম্মদ (সা) তো কোন যন্ত্রণাই অনুভব করছেন না। সুতরাং তিনি সাধারণ মানুষ মোটেই নন।

জয়নব একদিকে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলো এবং অন্যদিকে মহানবী (সা)-এর প্রতি ভক্তিতে শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়লো।

জয়নব মহানবী (সা)-র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলো। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ব্যক্তিগতভাবে জয়নবকে ক্ষমা করে দিলেন বটে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে বশরের মৃত্যু ঘটাবার অপরাধে তার প্রাণদন্ড নির্ধারিত হলো।

মুলতবি হজ্জ

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এক বছর কেটে গেছে। আকাশের বুকে আবার যিল হজ্জের চাঁদ উঁকি দিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মহানবী (সা) সাহাবীদের সাথে নিয়ে এবার মুলতবি হজ্জ পালনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

এবার দু'হাজার মুসলমান মক্কায় হজ্জ পালনের জন্য প্রস্তুত হলেন। কুরবানীর জন্য ৬০টি উট সঙ্গে নেয়া হলো। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রত্যেক

www.pathagar.com

মুসলমান মাত্র একখানি কোষবদ্ধ তরবারি সাথে নিলেন। তবে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য মহানবী (সা) আগেই দু'শো কুরাইশ বীরকে অস্ত্র সজ্জিত করে মক্কার বাইরে একটি গোপন স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। তাদেরকে চুপিসারে সেখানে অপেক্ষা করতে বলা হলো।

এবার মহানবী (সা) ক্রমশ মক্কানগরীর দিকে এগুতে লাগলেন। পবিত্র কাবাঘর দৃষ্টিতে পড়তেই তিনি বলে উঠলেন ঃ "লাব্বায়িক! লাব্বায়িক!" আমি হাজির, হে মহাপ্রভু, আমি হাজির! সাথে সাথে দু'হাজার কণ্ঠে সেই পবিত্র ঘোষণা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

দীর্ঘ সাত বছর পর আজ হযরত (সা) আপন জন্মভূমিতে ফিরে আসলেন। শৈশব-কৈশোর-যৌবনের কতই না স্মৃতি আজ তাঁর মনে আলোড়ন তুলছে! মক্কার শ্রেষ্ঠতম সন্তানকে পেয়ে মক্কাও যেন আজ উৎফুল্ল। মহানবী (সা)-র মনে পড়লো— সেই মক্কা, কাবা, হেরাগুহা, সওর পর্বত, আবদুল মুত্তালিব, প্রিয়তমা খাদিজা, কত কথা!

কুরাইশরা নবীজি (সা)-র আগমনের খবর পেয়ে মক্কা নগর ত্যাগ করে আগেই নিকটবর্তী পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের ভয় ছিল, এতকাল পরে বাগে পেয়ে মুসলমানরা যদি প্রতিশোধ নিয়ে বসে! অন্যদিকে যাদেরকে তারা একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল, প্রাণে মারার জন্য চক্রান্ত করেছিল, তারা এখন সদলবলে এসে হজ্জ করবে, কি করে কুরাইশ প্রধানরা ঐ দৃশ্য চোখে দেখবে? তার চেয়ে মক্কা ছেড়ে দূরে যাওয়াকেই তারা ভাল মনে করলো।

কুরাইশদের অত্যাচারে যে সব মুসলমান মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তারা এবার হজ্জ করতে মক্কায় এসেছেন। আপন পরিত্যক্ত ঘর-বাড়ি দেখে তারা চোখের পানি বুকে চেপে রাখলেন। কিন্তু কেউ ঘরে, ঢুকলেন না। বাইরে তাঁবু ফেলেই বাস করতে লাগলেন। তবু আজ মুসলমানরাই নৈতিক দিক দিয়ে বিজয়ী। এটাই তাদের বড় সাফল্য! এবার হুদায়বিয়ার চুক্তির সার্থকতা সকলের কাছে স্পষ্ট হলো।

www.pathagar.com

হযরত (সা) সাহাবীদের নিয়ে কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন। হযরত বেলাল (রা) কাবার ছাদে উঠে দরাজকণ্ঠে আযান দিলেন। হযরত (সা) সকলকে নিয়ে জোহরের নামায আদায় করলেন। কুরাইশদের পাষাণ মূর্তিগুলো অসহায়ভাবে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো।

কুরাইশদের কারো কারো কাছে এদৃশ্য অসহ্য লাগছিল। তারা বিবাদ বাধাবার জন্য মুসলমানদের উত্যক্ত করারও চেষ্টা করল। কিন্তু হযরতের সহনশীলতা ও অসীম ধৈর্যের কাছে সব উস্কানি ব্যর্থ হলো।

হজ্জের প্রাথমিক পর্ব শেষ হলো। সাফা ও মারওয়া পর্বত সাতবার সাঈ করে নবীজি উটগুলোকে সেখানেই কুরবানী দিলেন। দেখতে দেখতে তিনদিন পার হয়ে গেল। চতুর্থ দিন এসে কুরাইশগণ নবী করীম (সা)-কে মক্কা ত্যাগ করতে বললো। হযরত (সা) তাই করলেন। কেননা চুক্তির শর্ত তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে মুসলমানরা আর একটি ত্যাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আপন জন্মভূমিতে তাঁরা তিনদিন প্রবাসীর জীবন কাটিয়ে গেলেন।

হযরত (সা) মক্কায় যে কদিন ছিলেন, কারও ঘরে প্রবেশ করেন নি। তবে পরিচিতজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। সেই সূত্রে মায়মুনা নাম্নী তাঁর জনৈকা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়া বিধবা রমণী হযরত (সা)-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবার জন্য প্রস্তাব পাঠান। হযরত (সা) তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনি বিবি মায়মুনাকে মদীনায় নিয়ে যান।

তখনও মহাবীর খালিদ ইসলাম গ্রহণ করেন নি। খালিদ ছিলেন মায়মুনার আপন বোনের ছেলে। ওহুদ-যুদ্ধে এই খালিদই মুসলমানদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিলেন। মায়মুনার সাথে হযরত (সা)-এর নতুন আত্মীয়তা হবার পরেই খালিদ মদীনায় গিয়ে হযরত (সা)-এর হাতে হাত রেখে মুসলমান হলেন। মক্কার বিখ্যাত কবি আমর ইবনুল আ'স এবং কাবা-গৃহের চাবি রক্ষক ওসমান বিন তালহাও ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এবার কুরাইশদের একমাত্র আশা-ভরসার প্রতীক রইলো আবূ সুফিয়ান।

www.pathagar.com

মুতা অভিযান

মক্কা থেকে নবী করীম (সা) মদীনায় ফিরে আসার পর বনি সালেম গোত্রের কাছে একটি প্রচার-দল পাঠালেন। ঐ গোত্রের নেতা ইসলাম গ্রহণ করে হযরত (সা)-কে এসে বললেন, যদি একদল মুসলমানকে বনি সালেম গোত্রের কাছে পাঠানো যায়, তবে তারা মুসলমান হতে পারে। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী নবী করীম (সা) পঞ্চাশজন মুসলমানকে দাওয়াতী কাজের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা বনি সালেম গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন।

কিন্তু বনি সালেম গোত্রের লোকজন ঐ দাওয়াত শুধু প্রত্যাখ্যানই করে নি, তারা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রায় সকল মুসলমানকেই হত্যা করে। প্রচারকারী ঐ মুসলমান দলটি ছিল নিরস্ত্র। বনি সালেম গোত্রের নেতার কথায় মুসলমানরা আস্থাশীল ছিলেন। তাঁরা কোনরূপ অশুভ পরিণতির কথা চিন্তাই করেন নি। কিন্তু পঞ্চাশজন মুসলমানের একজন বাদে আর সবাইকে প্রাণ দিতে হল। ইসলামের জন্য তাঁরা অকাতরে প্রাণ দিয়ে গেলেন। এরপর চৌদ্দজন মুসলমানের আর একটি শাস্তি-সেনাদলকে সিরিয়ার জাৎ-আৎলা নামক স্থানে পাঠানো হল। এখানে মুসলমানদের করুণ পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়। ইসলাম গ্রহণের সরাসরি আহ্বান জানাতেই তারা হিংসায় পাগলের মতো হয়ে নিরস্ত্র মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফলে মুসলিম কাফেলার সবাইকে জীবন দিতে হল।

এমনি ধরনের বিপদ ও বাধা উপেক্ষা করে মহানবী (সা) ইসলামের দাওয়াতী কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যান। ইসলামের দাওয়াতপত্র সাথে নিয়ে হারিস-বিন-ওমায়ের নামক জনৈক সাহাবীকে হযরত (সা) বসরার শাসনকর্তার কাছে পাঠান। ওমায়ের মুতায় উপস্থিত হলে শোরাহ্ বিল নামক জনৈক খৃস্টান গোত্রপতি তাঁকে আটক করে সীমাহীন যন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে হত্যা করে। কোন দেশের দূতকে হত্যা করা সকল যুগে, সকল জাতির কাছেই ছিল নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক আইনেও এটা অবৈধ। এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করার জন্য হযরত (সা) দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন।

দূতকে হত্যা করেই খৃস্টানরা ক্ষান্ত রইল না। রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস প্রথমত হযরতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি দেখালেও পরে অবস্থার চাপে পড়ে

www.pathagar.com

তিনিও ইসলামের শত্রু হয়ে দাঁড়ান। সম্রাট হিরাক্লিয়াস ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও খৃস্টানদের ধর্মীয় আবেগ ও উগ্রতার কথা চিন্তা করে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতার থাবা বিস্তার করেন। ইসলামের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক শক্তিকে তিনি ভয় করতেন।

ফারোয়া নামক জনৈক আরব-খৃস্টান সিরিয়ার 'মা-আন' প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং চিঠি লিখে রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াস এখবর শুনে একটি ফন্দি আঁটলেন। তিনি তাঁকে খৃস্টধর্মে ফিরিয়ে নেবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি ফারোয়াকে পদোন্নতির লোভ দেখিয়ে খৃস্টধর্মে ফিরিয়ে নেবার উদ্যোগ নেন। কিন্তু ফারোয়ার ঈমান ছিল মজবুত। তিনি ইসলাম ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান।

সম্রাট অবাধ্য ফারোয়ার প্রাণদন্ডের আদেশ দেন। প্রাণের বিনিময়ে তিনি ঈমানের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ফারোয়া শাহাদৎ বরণ করলেন, তবু ইসলাম ত্যাগের প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি।

এদিকে খৃস্টানরা মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে। শোরাহ্ বিল এ ব্যাপারে খৃস্টানদের উৎসাহিত করত। মহানবী (সা)-র কাছে এ সংবাদ ঠিক সময়েই পৌছলো। তিনি তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী মুতার দিকে পাঠালেন।

দাস হলেন সিপাহসালার

জায়েদ হলেন এই বাহিনীর সিপাহসালার। জায়েদ ছিলেন ক্রীতদাস। নবী করীম (সা) যাঁকে আপন পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। সেনাপাতি জায়েদের নেতৃত্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আজ কাতারবন্দী। ইসলামে নেতার নির্দেশ পালন যে কতটা অত্যাবশ্যকীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নেতা যিনিই হন, তার সামাজিক মর্যাদা যা-ই হোক, তাকে মানতে হবে। আর মুক্ত ক্রীতদাসও যে চরিত্র ও প্রতিভা বলে নেতার পদে সমাসীন হতে পারেন, এটাও মহানবী (সা) প্রমাণ করে দিলেন। এভাবেই ইসলাম সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। আরবের প্রচলিত নিয়মে বংশীয় আভিজাত্যও এভাবেই চূর্ণ করে দেয়া হল।

www.pathagar.com

এই অভিযান প্রেরণের সময় মহানবী (সা) অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। সব অভিযানে ইতিপূর্বে একজন সেনাপতি ঠিক করে দেয়া হতো। কিন্তু এবার পর পর তিনজন সেনাপতিকে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব দেয়া হয়। মহানবী (সা) বললেন ঃ "যদি জায়েদের পতন হয়, তবে জাফর এবং জাফরের যদি পতন হয়, তবে আবদুল্লাহ্-বিন-রওয়াহা সেনাপতির দায়িত্ব নেবেন। যদি একে একে তিনজনই নিহত হন, তবে মুসলমানগণ নিজেদের মধ্য থেকে তাদের সেনাপতি নির্বাচন করে নেবেন।"

এই নির্দেশের মাধ্যমে মহানবী (সা) একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি সেনাপতি নিহত হন, তাহলে মুসলমানদের মধ্যে যাতে নেতৃত্বের সংকট দেখা না দেয়, মহানবী (সা) সে ব্যবস্থা করে দিলেন। অন্যদিকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের কঠিন বিপদের মাঝেও যাতে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ থাকেন এবং নেতা নির্বাচনের কাজে গাফেল না হন সে ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে এই ঘটনায়।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ্র নবী (সা) দূরদৃষ্টিতে যেন দেখতে পাচ্ছিলেন, এই যুদ্ধের সেনাপতিরা একে একে শাহাদৎ বরণ করতে যাচ্ছেন। তাই তিনি এই অপূর্ব ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন।

নবী করীম (সা) সেনা অভিযাত্রীদের এগিয়ে দেবার জন্য নিজে 'বিদায়-পর্বত' পর্যন্ত এসেছিলেন। যুদ্ধ যাত্রার আগে তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে কিছু উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ "সাবধান! কোন সাধু-সন্ন্যাসী, বালক-বালিকা বা স্ত্রীলোককে হত্যা করবে না। শত্রুদের কোন গাছ কাটবে না, কোন গৃহ জ্বালিয়ে দেবে না, শুধু আল্লাহ্র শত্রুকেই হত্যা করবে এবং সবসময় আল্লাহ্কে ভয় করে চলবে।"

সেনাপতি জায়েদ সিরিয়া সীমান্তে উপনীত হয়েই শুনতে পেলেন যে, 'মআব' অঞ্চলে এক লক্ষ খৃষ্টান সৈন্য তাদের মুকাবিলা করার জন্য অপেক্ষা করছে। সম্রাট হিরাক্লিয়াস নিজে তাদের পরিচালনা করছেন। এ খবর শুনে প্রথমদিকে মুসলমানরা একটু চিন্তিত হলেন। কেননা এক লক্ষ সৈন্যের বিপরীতে মুসলমানদের মাত্র তিন হাজার সৈন্য! মুসলমানরা পরস্পর আলোচনায় বসলেন— কিভাবে পরিস্থিতি মুকাবিলা করা যায়। কেউ কেউ সিদ্ধান্ত গ্রহণের

www.pathagar.com

জন্য মদীনায় খবর পাঠানোর প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ-বিন রওয়াহা বললেন ঃ "হে মুসলিম বীরদল, তোমরা এ কি কথা বলছ? যুদ্ধে আসার সময় তো আমরা লাভ-লোকসানের হিসাব করে আসিনি। শুধু জয়লাভই তো আমাদের কাম্য নয়, শাহাদৎও আমাদের কাম্য। যদি জয়লাভ করি ভালই, অন্যথায় ইসলামের নামে, আল্লাহ্‌র নামে আমরা শহীদ হবো। জয় হলেও আমাদের লাভ, পরাজয় হলেও আমাদের লাভ। কেন তবে দ্বিধা-সংকোচ? শত্রুদের সংখ্যা বেশি দেখে ভয় পাচ্ছ? কোন ভয় নেই। এই তিন হাজার সৈন্য নিয়েই আমরা তিন লক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আল্লাহ্‌র রহমতে আমরা জয়ী হব।"

ঈমানী প্রেরণায় উদ্দীপিত এই ভাষণ শুনে মুসলমান সৈনিকদের দ্বিধা-সংকোচ কেটে গেল। পরিণতি যাই হোক, যুদ্ধের জন্য সবাই প্রস্তুত হলেন।

মুতা নামক স্থানে মুসলিম ও খৃস্টান বাহিনীর মধ্যে মুকাবিলা হলো। সেনাপতি জায়েদের নেতৃত্বে যুদ্ধ শুরু হলো। কিন্তু তিনি শাহাদতের কোলে ঢলে পড়লেন। এরপর সোনাপতির পতাকা তুলে নিলেন জাফর। তিনিও শহীদ হলেন। আবদুল্লাহ্ ছুটে এসে পতাকা তুলে নিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকেও শহীদ হিসেবে কবুল করলেন।

এবার মুসলমানরা মহানবী (সা)-র পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, সেনাপতি খালিদই এই দুর্যোগে নেতৃত্ব করার একমাত্র ব্যক্তি। সবাই মিলে তাঁকে সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন।

মহাবীর খালিদ এই যুদ্ধের মাত্র অল্প কিছুদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। গোটা আরবে খালিদের বীরত্ব ও যুদ্ধ পরিচালনার নৈপুণ্য সম্পর্কে কারও মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। স্বয়ং মহানবী (সা)-ও খালেদের অসীম বীরত্বের কথা জানতেন। কিন্তু ইসলামের শুরুতেই যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের উপস্থিতিতে হয়তো নবী করীম (সা) খালিদকে সেনাপতি করতে চাননি। তিনি খালিদের নেতৃত্বকে পরিস্থিতির ওপর ছেড়ে দিয়ে সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। অথচ সময়ের প্রয়োজনে মুসলমানরাই তাঁকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছেন। এর চেয়ে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?

সেনাপতি খালিদের হাতে নেতৃত্ব ন্যস্ত হওয়ার পর মুসলমান সৈনিকবৃন্দ নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে পরপর তিনজন সেনাপতির

www.pathagar.com

শাহাদৎবরণ মুসলমানদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছিল। সেনাপতি খালিদ তাঁদের পুনরায় আত্মশক্তিতে উঠে দাঁড়াবার সাহস যোগালেন। কিন্তু সেনাপতি খালিদ ঐ অবস্থায় যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন না। তিনি কৌশলে সৈন্যদল নিয়ে পিছু হটে আসলেন।

মহানবী (সা) গায়েবী মদদে ভবিষ্যত প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি একদল সাহায্যকারী সেনাকে মুতা অভিমুখে আগে-ভাগেই পাঠিয়েছিলেন। এই সেনাদলটি এসে খালিদের বাহিনীর সাথে মিলিত হল। এবার নতুন শক্তি বিন্যাস করে সেনাপতি খালিদ রোমানদের মুখোমুখি হলেন। রোমানরা ভাবল, মদীনা থেকে বিপুল সৈন্য এসে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে।

নতুন করে যুদ্ধ শুরু হলো। এবার আক্রমণের ভূমিকায় মুসলমানরা। মুসলমানদের তীব্র আক্রমণের মুখে রোমানরা টিকতে পারল না। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এই যুদ্ধে একা মহাবীর খালিদের হাতেই আটখানা তরবারি ভেঙেছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, যুদ্ধের গতি কত তীব্র ছিল।

বিজয়ের গৌরব নিয়ে মুসলমানরা মদীনায় ফিরে এলেন। জাফর, জায়েদ ও আবদুল্লাহ্ (রা)-কে হারিয়ে মহানবী (সা) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। জাফরের ঘরে গিয়ে তিনি তাঁর পুত্র-কন্যাদের স্নেহ-আদর করলেন। জাফরের স্ত্রী আসমা কেঁদে আকুল হল। তাঁর কান্না দেখে মহানবী (সা)-ও কাঁদতে লাগলেন। জনৈক সাহাবী বললেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি যদি এভাবে কাঁদেন, তবে আমরা কি করব?"

নবীজি বললেন ঃ "এ কান্না দোষের নয়, এ কান্না বন্ধুর প্রতি বন্ধুর সমবেদনা প্রকাশ।"

মক্কা অভিযান

হুদায়বিয়ার চুক্তির পর দু'টি বছর কেটে গেছে। চুক্তির একটি শর্ত ছিল যে, আরবের যে কোন গোত্র হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে অথবা কুরাইশদের সাথে স্বাধীনভাবে যোগাযোগ রাখতে পারবে, তাতে কোন পক্ষই বাধা দিতে পারবে না। এই চুক্তির পর মক্কার 'খোজা' সম্প্রদায় মহানবী (সা)-র পক্ষ অবলম্বন

www.pathagar.com

করে। আর বনি বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে যোগ দেয়। বনি খোজা ও বনি বকর সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই শত্রুতা চলে আসছিল। এক্ষণে পুরনো শত্রুতা আরও বৃদ্ধি পেল।

খোজা সম্প্রদায় 'ওয়াতির' নামক স্থানে এক নিভৃত পল্লীতে বাস করত। তারা যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন কুরাইশ ও বনি বকর গোত্রের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের গ্রাম আক্রমণ করল। এই আক্রমণের ফলে বহু নিরীহ নর-নারী প্রাণ হারাল। অনেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য কাবাঘরে আশ্রয় নিল। কাবার সীমানায় হত্যাকাণ্ড বা রক্তপাত নিষিদ্ধ থাকলেও কুরাইশ ও বনু বকর গোত্রের লোকেরা তা মানল না। তারা খোজাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল।

এই হত্যার বিচার প্রার্থনা করল আল্লাহ্‌র নবী (সা)-র দরবারে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুসলমানরা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় দিক দিয়েই খোজাদের সাহায্য করতে বাধ্য ছিলেন।

মহানবী (সা) খোজাদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তবে সরাসরি অভিযান না পাঠিয়ে তিনি কুরাইশদের কাছে প্রথমে দূত পাঠালেন। দূতের মাধ্যমে তিনি তাদের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব দিলেন ঃ

১. হয় তারা বনি খোজা গোত্রকে উপযুক্ত অর্থ দিয়ে এই অন্যায়ের প্রতিকার করবে, অথবা

২. বনি বকর গোত্রের সাথে কুরাইশরা সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

৩. অন্যথায় হুদায়বিয়ার চুক্তি বাতিল হয়েছে বলে ঘোষণা করবে।

কুরাইশরা অনেক দিন থেকেই হুদায়বিয়ার চুক্তির শর্ত মানতে চাইছিল না। তারা সুযোগ পেয়ে শেষের শর্তটি গ্রহণ করল।

কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান ছিল কূটবুদ্ধির লোক। হুদায়বিয়ার চুক্তি বাতিল করে কুরাইশরা যে ভাল কাজ করেনি, সেটা অনুভব করে সে মনে মনে উদ্বিগ্ন হলো। কুরাইশরা চুক্তি বাতিল করে স্বেচ্ছায় যে যুদ্ধের ঝুঁকি মাথায় নিয়েছে, সেটা বুঝতে তাদের দেরি হলো না। এবার তাদের ভয় হলো, মুসলমানরা হয়তো খুব সহসাই মক্কা আক্রমণ করে বসবে।

www.pathagar.com

আবূ সুফিয়ান তড়িঘড়ি মদীনায় এসে মহানবী (সা)-র কাছে বললো ঃ "বনি বকর গোত্রের লোকদের সাহায্য করলে হুদায়বিয়ার চুক্তি তো তাতে লংঘিত হচ্ছে না। আমরা এখনও ঐ চুক্তি মেনে চলতে প্রস্তুত আছি।"

আবূ সুফিয়ানের এ শঠতাপূর্ণ প্রস্তাবের জবাবে মহানবী (সা) পাল্টা প্রশ্ন তুললেন, হুদায়বিয়ার চুক্তি যদি মেনেই চলবে, তবে উপযুক্ত অর্থদন্ড দিয়ে বনি খোজাদের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছ না কেন? এটা করলেই বুঝতাম যে, সত্যিই তোমরা আমার সাথে শান্তি বজায় রাখতে ইচ্ছুক। শুধু মুখের কথায় চলবে না।"

আবূ সুফিয়ান এ কথার জবাব এড়িয়ে গেল। সে মদীনাবাসীদের উদ্দেশে মসজিদ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বলে গেল যে, "আমি হুদায়বিয়ার চুক্তি পুনঃস্থাপিত করে গেলাম।" এই বলে সে মদীনা থেকে মক্কায় চলে যায়। এদিকে মহানবী (সা) সময় নষ্ট না করে মক্কায় অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিলেন। আবূ সুফিয়ানের মতলব ভালো ছিল না। হুদায়বিয়ার চুক্তির দোহাই দিয়ে মুসলমানদের নিষ্ক্রিয় রেখে অন্যদিকে নতুন করে মক্কায় যারা ইসলাম গ্রহণ ও মুসলমানদের পক্ষ নিবে, তাদের সমূলে বিনাশ করবে। এভাবেই কুরাইশরা ইসলামের সম্প্রসারণ রোধ করার অভিসন্ধি আঁটে। কুরাইশরা হুদায়বিয়ার চুক্তিকে একতরফাভাবে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে।

হুদায়বিয়ার চুক্তিতে সাতটি শর্ত ছিল। ছ'নম্বর ধারায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, 'আরবদের যে কোন গোত্র কুরাইশদের অথবা মুহাম্মদের সাথে স্বাধীনভাবে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে।'

বনি খোজা গোত্রের লোকজন যখন মুসলমানদের সাথে স্বাধীনভাবে যোগদান করেছে, তখন তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার কোন অধিকার ছিল না কুরাইশদের। সুতরাং কুরাইশরা নিজেরাই চুক্তির শর্ত লংঘন করে চুক্তিকে বহাল রাখতে চাইতে পারে না। কুরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তি বলবৎ থাকবে দাবির কোন বৈধ ভিত্তি থাকতে পারে না। উপরন্তু মহানবী (সা) বনু খোজাদের হত্যাকাণ্ডের পর কুরাইশদের কাছে সরাসরি যে তিনটি প্রস্তাব দেন, তাতেও হুদায়বিয়ার চুক্তি বাতিল হয়েছে, এমন ঘোষণার আহবান জানানো হয়। কুরাইশরা এ প্রস্তাব গ্রহণও করেছে। সুতরাং কোনভাবেই আর হোদায়বিয়ার

www.pathagar.com

চুক্তি বহাল থাকতে পারে না।

সুতরাং মুসলমানরা অতি গোপনে যুদ্ধ প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থকেন। অভিযানের উদ্দেশ্য গোপন রেখে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। অভিযানের খবর যাতে মদীনায় না পৌঁছে, সেজন্য মদীনার চারপাশে কড়া পাহারা মোতায়েন রাখা হয়। এই গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরাইশদের প্রস্তুত হবার সুযোগ না দেওয়া। কুরাইশরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসলে সম্মুখ যুদ্ধে তারা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। মহানবী (সা) বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করতে চেয়েছিলেন।

এ সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। হাতিব নামক জনৈক সাহাবী মদীনায় চলে এসেছিলেন। তবে তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন তখনও মক্কায় অবস্থান করছিল। তার আশংকা ছিল, মক্কা আক্রমণের সময় তার স্ত্রী-পরিজনদের জীবন বিপন্ন হতে পারে, কুরাইশরা তাদের হত্যা করতে পারে। এই আশংকায় তিনি একখানি গোপন চিঠিসহ জনৈকা ক্রীতদাসীকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। ঐ পত্রে মক্কা আক্রমণের আগাম খবর দিয়ে কুরাইশদের সাবধান করে দেওয়া হয়।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এই গোপন তথ্য মহানবী (সা) জানতে পারলেন। তিনি লোক পাঠিয়ে পত্রবাহিকা ক্রীতদাসীকে পাকড়াও করে নিয়ে আসলেন।

এই কাজের জন্য হাতিবের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। হাতিব হযরতের কাছে সব কথা খুলে বললেন। হাতিবের কথায় হযরত (সা) সন্তুষ্ট হলেন না। জাতির স্বার্থের উর্ধ্বে তিনি পরিবারের স্বার্থকে স্থান দিয়েছেন। যাহোক, হাতিব এ যাবত ইসলামের জন্য যে ত্যাগ করেছেন, তা স্মরণ করে হযরত (সা) তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।

দশ হাজার মুসলিম সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। ১০ই রমযান হযরত (সা) সকলকে নিয়ে মক্কা যাত্রা করলেন।

মক্কার উপকণ্ঠে 'মার উজ্-জহ্‌রাক' নামক স্থানে হযরত (সা) শিবির স্থাপন করেন। সন্ধ্যায় খাদ্য তৈরীর জন্য শিবিরে আগুন জ্বালানো হলো। দূর থেকে অসংখ্য আগুনের শিখা দেখা গেল। কুরাইশরা এ দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেল।

www.pathagar.com

আবূ সুফিয়ানের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কি করে মুসলমানরা এত শীঘ্র মক্কার উপকণ্ঠে এসে পড়লো! কুরাইশদের কোন প্রস্তুতি নেই। এমন অভিযানের খবর কুরাইশরা আগে-ভাগে জানতে পারে নি। মদীনাবাসী সত্যি কি তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এসেছে? তাহলে তাদের সৈন্য সংখ্যাই বা কত? এমন প্রশ্ন কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ানকে উদ্বিগ্ন করে তুলল।

আবূ সুফিয়ান রাতের অন্ধকারে অপর দু'জন সংগীসহ মুসলমানদের শক্তি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য মুসলিম শিবিরের কাছাকাছি গিয়ে পৌছল।

মুসলমানরা আগে থেকেই শিবিরের চারদিকে গোপন পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ পাহারাদারদের চোখে অন্ধকারে কয়েকটি ছায়ামূর্তি দেখা গেল। 'দাঁড়াও! তোমরা বন্দী!' হযরত উমর (রা) হাঁকলেন। তিনি ও-দিকটায় নজর রাখছিলেন। আর সুফিয়ান ও তার সহচর দু'জন মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। তাদেরকে মহানবী (সা)-র দরবারে উপস্থিত করা হল।

এই আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বেই মুসলমানদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে। অনেককে জীবন দিতে হয়েছে জাহেলী আক্রোশের হাতে। মুসলমানদের দলে দলে দেশ ছাড়তে হয়েছে কুরাইশদের অত্যাচারে। আর আবূ সুফিয়ান এসব নৃশংস কাজের প্রধান নেতাদের একজন।

আবূ সুফিয়ান ছিল ইসলামের শত্রু, মহানবী (সা)-র প্রাণের শত্রু। বন্দী অবস্থায় তাকে সামনে পেয়ে মহানবী (সা) বললেন ঃ "আবূ সুফিয়ান, এখনও কি তোমার ভুল ভাংবে না? এখনও কি তুমি আমাকে আল্লাহ্‌র রসূল বলে স্বীকার করবে না? এখনও কি দেব-দেবীকে সত্যি বলে মনে করবে?"

এ প্রশ্ন কিছুদিন ধরে আমার মনেও দেখা দিয়েছে। দেব-দেবীকে এখন আর কি করে সত্যি বলি। তারা সত্যি হলে নিশ্চয়ই বিপদে আমাদেরকে সাহায্য করত!" আবূ সুফিয়ান শেষ পর্যন্ত এটা স্বীকার করল।

মহানবী (সা) বললেন ঃ "তবে আর কেন? বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্!"

আবূ সুফিয়ানের পাষাণ মন এবার গলে গেল। আল্লাহ্‌র নবী (সা)-র সাথে তিনি অতীতে কত শত্রুতা করেছেন। তার প্রতিদানে মহানবী (সা) যে উদার ও

www.pathagar.com

মানবিক ব্যবহার করেছেন, আবূ সুফিয়ান তাতে মুগ্ধ, বিস্মিত। এও কি সম্ভব? এতবড় পাষাণ প্রাণ শত্রুকে বাগে পেয়ে কেউ কি প্রতিশোধ না নিয়ে ছেড়ে দেয়? আবূ সুফিয়ান আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি অনুচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্!"

মুহূর্তে ইসলাম ও কুফরীর দেয়াল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মহানবী (সা) আবূ সুফিয়ানকে বুকে টেনে নিলেন। আজকের দিনে আবূ সুফিয়ান এসে মিশে গেছেন একই ঈমানের স্রোতধারায়। শক্তির মাধ্যমে বিজয়ের চেয়ে প্রেম, করুণা, মানবতা ও মহত্ত্বের মাধ্যমে বিজয় অনেক গৌরবের।

ইসলাম গ্রহণ করার পর আবূ সুফিয়ান নিজের সম্পর্কে নিঃসংশয় হলেও এবার তাঁর এতকালের অনুগত কুরাইশদের ভাগ্য সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখনও কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করে নি। আবূ সুফিয়ান নিজেই যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন কে আর কুরাইশদের নেতৃত্ব দেবেন? তাছাড়া ইসলাম আজ বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

আবূ সুফিয়ান বললেন, "হে আল্লাহ্র নবী! আপনি কি কুরাইশদেরকে ধ্বংস করে ফেলবেন? আজ যদি আপনি অনুগ্রহ না করেন, তবে আপনার জাতি ও গোত্রের লোকেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

হযরত (সা)-এর চাচা আব্বাস এতদিন কুরাইশদের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন নি। এবার তাঁর সে ভয় দূর হলো। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আবূ সুফিয়ানের পক্ষ থেকে আব্বাস বললেন ঃ "আবূ সুফিয়ান ছিলেন এতদিন কুরাইশদের নেতা, আজকের এই দিনে তাঁকে এমন কিছু মর্যাদা দাও, যাতে তাঁর ইজ্জত বাঁচে।"

মহানবী (সা) বললেন ঃ "নিশ্চয়ই তাঁকে মর্যাদা দেব।" তিনি আবূ সুফিয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "নগরে গিয়ে ঘোষণা করে দাও, আবূ সুফিয়ানের নাম যারা নিবে, অথবা তার ঘরে যারা আশ্রয় নিবে, তাদের কোন ভয় নেই। এ ছাড়া নিজের ঘরে যারা দরজা বন্ধ করে থাকবে অথবা কাবাঘরে আশ্রয় নিবে, তাদের কোন ভয় নেই। তাদেরকে আজ আমি কিছু বলবো না।"

আবূ সুফিয়ান আশ্বস্ত হলেন। আল্লাহ্র নবীর উদারতায় তিনি মুগ্ধ—

www.pathagar.com

বিস্মিত। ইসলামের সত্য ও সৌন্দর্য্যের রূপ দেখে তিনি বিমোহিত। তিনি মক্কায় ছুটে গিয়ে ঘোষণা করে দিলেন ঃ "কুরাইশগণ শোন। মুহাম্মদ দশহাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের দুয়ারে এসে পড়েছেন। আজ আর কারও নিস্তার নেই। যে কেউ কাবা ঘরে অথবা আমার ঘরে আশ্রয় নিবে অথবা নিজের ঘরে আবদ্ধ থাকবে, সে-ই আজ নিরাপদ। আমি এখন আর তোমাদের দলপতি নই। আমি এখন মুসলমান।"

এবার কুরাইশদের সকল আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এতকাল তো আবূ সুফিয়ানই শক্তি দিয়ে সাহস দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তাদেরকে চাঙ্গা করে রেখেছেন। মক্কা নগরীকে মুসলমানদের সম্ভাব্য হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য আজও কুরাইশরা প্রতীক্ষার প্রহর গুণছিল। আর সে কারণেই মুসলিম বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে আগাম তথ্য সংগ্রহের জন্য আবূ সুফিয়ান দু'জন সাথী নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু একি হলো আজ ? আবূ সুফিয়ান নিজেই যে মুসলমান হয়ে এসেছেন। তিনি আজ কুরাইশদের অভিভাবকত্ব প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করছেন এবং মুসলমানদের পক্ষে কথা বলছেন!

কুরাইশরা আর কোনরকম কথা না বাড়িয়ে যে যার মতো নিরাপদ আশ্রয় নিল। পরদিন সকালেই মহানবী (সা) দশ হাজার বিজয়ী মুসলিম সেনার এক বাহিনী নিয়ে বীর পদবিক্ষেপে মক্কা নগরীর দিকে এগিয়ে চললেন। একদিকে নিজ জন্মভূমিতে ফিরে যাবার ব্যাকুল আকাঙক্ষা, অন্যদিকে বিজয়ের পরম অনুভূতি আজ মুসলমানদের কিছুটা স্মৃতিতাড়িত করে অতীতের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তবে মুসলমানদের মধ্যে বিজয়ের কোন উল্লাস নেই, অহংকার নেই। সকলের শেষে ক্রীতদাস জায়েদের পুত্র উসামার সাথে হযরত (সা) একই উটের পিঠে চড়ে নীরবে এগুচ্ছেন! সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন নজীর নেই যে, শত্রুকে বাগে গেয়ে কেউ তাকে ক্ষমা করেছে। এমন নজীরও নেই যারা বিজয়ের সুযোগ পেয়েও নীরবে নগরীতে প্রবেশ করেছে!

নবুয়ত প্রাপ্তির দীর্ঘ একুশ বছর পর আজ হযরত (সা) বিজয়ীর বেশে মক্কায় এসেছেন। বিজয়ের পরিতৃপ্তিতে তাঁর অতীতের আঘাত— শত্রুতা ও বেদনার গ্লানি মুছে গেছে। 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হয়েই তিনি আজ মক্কায় এসেছেন!

www.pathagar.com

নবী (সা) যা বলেছেন এবং যা করেছেন, তা তো সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় করেছেন। নবুয়ত প্রাপ্তির আগে, চল্লিশ বছর তিনি মক্কাবাসীদের সাথেই জীবন কাটিয়েছেন। কারও সাথে তাঁর কোন বিরোধ ছিল না, ঝগড়া-বিবাদ ছিল না। উপরন্তু সততা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর জন্য মক্কাবাসীরাই তাকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

মহানবী (সা) জানেন, তাঁর বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের কোন শত্রুতা থাকতো না, যদি তিনি ইসলামের প্রতি সকলকে আহবান না জানাতেন। এখন ইসলামই যখন গোটা আরবে বিজয়ী হয়েছে, তখন তো মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত ক্ষোভ প্রতিহিংসা থাকতে পারে না।

মহানবী (সা) মক্কায় প্রবেশের পর প্রথমেই পবিত্র কাবা ঘরের দিকে এগুতে লাগলেন। পরম পরিতৃপ্তির সাথে সাথী সাহাবীদের নিয়ে কাবার চারদিকে সাতবার তাওয়াফ করলেন। অনেক কুরাইশ নর-নারী কাবা ঘরে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছিল, তারা সভয়ে মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল।

তাওয়াফ শেষে হযরত (সা) কাবার ভেতরে প্রবেশ করে প্রাণভরে 'আল্লাহ্ আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। সাথী মুসলমানদের কণ্ঠে সে আহবান ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। তৌহিদের উচ্চকিত আওয়াজে কাবায় রক্ষিত পাথরের মূর্তিগুলি কেঁপে উঠলো। তখনও পবিত্র কাবাঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। মূর্তিগুলির কাছে নবীজি এগিয়ে গিয়ে বললেন ঃ "সত্য আজ সমাগত। মিথ্যা বিতাড়িত। মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।"

মহানবী (সা) এবার উমর (রা)-কে মূর্তিগুলি বাইরে ফেলে দেবার হুকুম দিলেন। উমর (রা) তাই করলেন। মূর্তিপূজকদের অভিশাপ থেকে কাবা মুক্ত হল। মক্কার কাফিররা নীরবে সবই দেখল। কিন্তু তাদের কিছুই করার নেই।

নামাযের সময় উপস্থিত হলে হযরত (সা) কাবা চত্বরে সকলকে সমবেত হতে বললেন। হযরত বেলাল (রা) কাবায় প্রথম আযান দিলেন। সকলে নবীজির ইমামতিতে নামায আদায় করলেন। মক্কার কাফিররা নামাযের এই দৃশ্য দেখল। নামায শেষ হল। এবার মহানবী (সা) কুরাইশ নর-নারীদের দিকে দৃষ্টি দিলেন।

www.pathagar.com

কুরাইশদের তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কুরাইশগণ! তোমরা আজ কি ভাবছ ?"

"আমাদের নিয়তির কথা ভাবছি।" তারা জবাব দিল। "অনেকদিন ধরে আমরা তোমার উপর যে অত্যাচার করেছি, আজ তার কি প্রতিফল দিবে, তাইই ভাবছি।"

মহানবী (সা) কুরাইশদের অসহায়ত্বের দিকটি অনুভব করেই ঐ প্রশ্নটি করেছিলেন।

মহানবী (সা) বললেন ঃ "আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনই অভিযোগ নেই। তোমাদের সব অপরাধ মাফ করে দিলাম। যাও তোমরা সবাই মুক্ত — স্বাধীন।"

কুরাইশরা এমনটা ভাবতে পারেনি। এতবড় মহত্ত্ব দেখানো কি মানুষের পক্ষে সম্ভব ? পাষাণ-হৃদয় কুরাইশদের অন্ধ অহমিকা চূর্ণ হয়ে গেল। তারা সমস্বরে বলে উঠলোঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্!"

ইতিহাসের এই সুদূরপ্রসারী বিজয় এমনি নীরবে-নিভৃতে ঘটে গেল। মিথ্যার উপর সত্যের বিজয় এমনি করেই হয়। ইসলাম একদিন মক্কায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, ইসলামের নবীকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল, সেই মক্কায় আজ ইসলাম বিজয়ীর বেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। এর চেয়ে বড় পাওনা আর কি হতে পারে?

মক্কা বিজয়ের পরে

মক্কা বিজয়ের পরের দিন।

মক্কায় নতুন ইতিহাসের বাতাস বইছে। জাহেলিয়াতের অন্ধকারের যুগ শেষ হয়েছে। সত্যের আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কুরাইশ ও মুসলমানদের শত্রুতার অবসান ঘটেছে। মরু মক্কায় এক রক্তপাতহীন বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেল।

মক্কা বিজয় কোন রাজ্য বিজয় নয়। এ হচ্ছে অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের বিজয়। অনাদর্শের বিরুদ্ধে আদর্শের বিজয়। জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশার বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়।

www.pathagar.com

মহানবী (সা) মক্কাবাসীদের ইতিপূর্বেই সাধারণ ক্ষমা মঞ্জুর করেছিলেন। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী পাষাণ হৃদয় হিন্দা, যে ওহুদ যুদ্ধে হযরত (সা)-এর চাচা হামজার কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল, সে-ও আজ ক্ষমা পেল। ফুজালা নামক এক উদ্ধত বেদুঈন কাবা প্রদক্ষিণের সময় হযরত (সা)-কে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিল, মহানবী (সা) তাকেও মাফ করে দিলেন।

আবূ জেহেলের পুত্র ইকরামা এই হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল, প্রাণভয়ে সে সমুদ্র পথে দেশান্তরী হবার উদ্যোগ নিচ্ছিল, তাকেও ফিরিয়ে আনা হল। নগরের সীমানায় হযরত (সা) রক্তপাত নিষিদ্ধ করে দিলেন। কিন্তু খোজা সম্প্রদায় সুযোগ পেয়ে বনি বকর গোত্রের উপর আক্রমণ করে একজনকে নিহত করে বসল। এই খোজাদের বহুলোক বকর গোত্রের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল।

মহানবী (সা) এজন্য খোজাদের ডেকে তিরস্কার করে দিলেন। নিহত ব্যক্তির রক্তের পণ নবীজি (সা) নিজের তরফ থেকে পরিশোধ করে দিলেন। এবং হুকুম দিলেনঃ এখন থেকে যে কেউ নরহত্যা করবে, তাকে নিজের রক্ত দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

মক্কার উপকণ্ঠে কতিপয় গোত্র বাস করতো। নবীজি (সা) তাদের কাছেও শান্তির পয়গাম পাঠালেন। হযরত খালিদকে পাঠানো হলো বনি-যাজিমা গোত্রের কাছে। হযরত খালিদ ইসলামের নামে তাদের আহবান করলেন। কিন্তু তাঁরা এর জবাবে হযরত খালিদের প্রতি রূঢ় আচরণ করল। হযরত খালিদের রক্ত এই দুর্ব্যবহার সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। এতে বনি যাজিম গোত্রের কয়েকজন প্রাণ হারাল।

হযরতের কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি খালিদের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে বললেন ঃ 'ইয়া আল্লাহ্! তুমি জান, খালিদের এ কাজের সাথে আমার কোন যোগাযোগ নেই।" তিনি উপযুক্ত রক্তপণসহ হযরত আলী (রা)-কে বনি যাজিমদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। এভাবেই বনি যাজিম গোত্রের ক্ষোভ ও বেদনা প্রশমিত হল।

এদিকে বিজয়ের খবর দিকে দিকে পৌঁছলে দলে দলে লোক এসে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। হযরত আবূ বকরের বৃদ্ধ পিতা আবূ-কূহাফাও নবী (সা)-

www.pathagar.com

র দরবারে পুত্রের হাত ধরে এসে হাজির হলেন। মহানবী (সা)-র বয়োজ্যেষ্ঠ আবূ কূহাফাকে পরম যত্নের সাথে হাত ধরে নিজের পাশে বসালেন। আবূ বকর (রা)-কে বললেন ঃ তাকে কেন কষ্ট দিলে? আমাকে বললে তো আমিই যেতাম।

আবূ-কূহাফা জীবন-সায়াহ্নে কলেমা পড়ে মুসলমান হলেন।

কাবা শরীফের চারদিকের দেয়াল ভেংগে পড়ছিল। হযরত (সা) তা মেরামত করালেন। উসমান বিন তালহা ছিলেন কাবা ঘরের চাবি রক্ষক। হযরত (সা) তালহাকে ডেকে কাবার চাবি পুনরায় তাঁর হাতেই দিলেন। হামজা ছিলেন জমজমের পানি সরবরাহের দায়িত্বে, হযরত (সা) তাঁকে সে দায়িত্ব দিলেন। এবার হযরত (সা) মক্কাবাসীদের নিয়ে এক সভা করলেন। এই সভায় তিনি একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন।

বললেন ঃ "হে কুরাইশগণ! অতীত যুগের সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা মন থেকে মুছে ফেল। কৌলীন্যের গর্ব ভুলে যাও। সকলে এক হও। সকল মানুষই সমান— একথা বিশ্বাস কর। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "হে মানুষ, আমি তোমাদের সকলকেই (একই উপাদানে) স্ত্রী-পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে ও শাখায় পৃথক করেছি— যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার।"

এভাবেই হযরত (সা) মরু আরবের কঠোর হৃদয় সাহসী আরব জাতির হৃদয়ে ফুঁকে দিলেন এক মহাবিপ্লবের ফল্গুধারা।

হুনায়েন ও তায়েফ অভিযান

মক্কা বিজয়ের পর হযরতকে আরও কয়েকটি ছোটখাট অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছে।

হাওয়াজিন নামক দুর্ধর্ষ এক বেদুঈন গোত্র দীর্ঘদিন যাবত হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণ করছিল। মক্কার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তায়েফের নিকটবর্তী একটি পার্বত্য অঞ্চলে ছিল তাদের বসতি। কুরাইশদের মতো এরাও ছিল পৌত্তলিক। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত নানাভাবে এরা আরবের বিভিন্ন গোত্রকে সাহায্য করে আসছে। এতদিন মক্কা ছিল কুরাইশদের হাতে। তাই তারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করত। কিন্তু যখন দেখল মুহাম্মদ (সা) মক্কা জয় করে নিয়েছেন এবং

www.pathagar.com

কুরাইশ ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহ ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন তারা বিপদ ভাবল। মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে পারে, এই আশংকায় তারা হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের আয়োজন করে বসল। তায়েফের বনি সাকিফ্ গোত্রও তাদের সাথে যোগ দিল। এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তারা হযরত (সা)-কে মুকাবিলার জন্য রওয়ানা হল।

দেড় হাজার মদীনাবাসীর সাথে দু'হাজার নব দীক্ষিত কুরাইশ বীরও যুদ্ধের জন্য তৈরি হল। আবূ সুফিয়ানের মতো প্রবীন যোদ্ধা ও সেনাপতিও আজ ইসলামের অনুগত খাদেম হয়ে যুদ্ধযাত্রা করছেন।

মা'জ বিন জাবাল নামক জনৈক কুরআন বিশারদ তরুণকে হযরত (সা) তাঁর অবর্তমানে মক্কার মু'আল্লিম নিযুক্ত করলেন। আত্তার নামক অপর এক তরুণ কুরাইশ মুসলিমকে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হল।

মুসলমানদের বাহিনীতে তখন বারো হাজার সৈন্য। আর বিপক্ষে চার-পাঁচ হাজার সৈন্য। সংখ্যাধিক্যের অহমিকায় মুসলমানদের মধ্যে আগে-ভাগেই বিজয়ের ধারণা এসেছিল।

কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। জয়-পরাজয়ের মালিক তো মানুষ নয়। আল্লাহ্ই জয়-পরাজয় নির্ধারণ করেন।

'হুনায়েন' নামক স্থানে মুসলিম বাহিনী শিবির স্থাপন করে রাত কাটাল। তার অল্প দূরেই হাওয়াজিন সৈন্যরা অবস্থান করছিল। মুসলিম বাহিনীর খবর পেয়ে তারা পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে আত্মগোপন করে রইল। মুসলমানরা তা টেরও পেল না।

পরদিন সকালে মুসলমানরা হুনায়েন ত্যাগ করে চলল। সহসা পথের দু'ধার থেকে হাওয়াজিনগণ মুসলমানদের আক্রমণ করে বসল। অপ্রস্তুত অবস্থায় মুসলমানরা সে আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। কেননা চোরাগোপ্তা আক্রমণ কোন দিক থেকে আসছে, তা ঠাহর করতেই বেশ সময় কেটে গেল। মুসলমান সৈনিকরা আত্মরক্ষার জন্য দিগ্বিদিক ছুটতে লাগল। এভাবে মুসলমানরা অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হল।

www.pathagar.com

হযরত (সা) বাহিনীর পেছনে ছিলেন। তিনি পলায়নপর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ কোথায় চলছ তোমরা, ফিরে, দাঁড়াও! এই যে আমি এখানে।"

হযরত (সা)-এর পাশে ছিলেন আব্বাস (রা)। তিনিও ভীত-সন্ত্রস্ত মুসলমানদের শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আবার নতুন করে ব্যূহ রচিত হলো। নতুন সাহসে, নতুন উদ্দীপনায় স্বয়ং রাসূলে খোদার নেতৃত্বে প্রচণ্ড গতিতে যুদ্ধ শুরু হল। হাওয়াজিনগণ এবার প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটল। তাদের স্ত্রী-পুত্র কন্যা ও ধন-দওলত ফেলে রেখেই তারা স্থান ত্যাগ করল।

মুসলমানদের হাতে অনেক সোনা-রূপা জমা হল। বহু সৈন্য ও নর-নারী বন্দী হল।

ওহুদে ও হুনায়েনে মুসলমানরা মার খেয়ে প্রচুর শিখেছেন। ওহুদে জয়ী হয়ে পরে তাদের পরাজিত হতে হয়েছে। হুনায়েনে তারা পরাজিত হয়ে পর মুহূর্তে জয়ী হয়েছেন। ওহুদে মুসলমানরা শিখেছেন নেতৃ-আদেশ লংঘন করার শোচনীয় পরিণাম। হুনায়েনে শিখেছেন অহংকার করার পরিণাম। হাওয়াজিনগণ পালিয়ে গিয়ে তায়েফ নগরে আশ্রয় নিল।

হযরত (সা) এবার তায়েফ অবরোধ করলেন। কিন্তু দুর্গ দখল করা ছিল কঠিন। দুর্গের চারদিকে ঘন আঙ্গুর বন ছিল। এতে হাওয়াজিনদের বেশ সুবিধা হচ্ছিল। হযরত (সা) ঐ বন কেটে ফেলার হুকুম দিলেন। এবার তায়েফবাসীদের দুর্বল যায়গায় ঘা পড়ল। তারা নবী (সা)-এর কাছে দূত পাঠাল। অনুরোধ জানাল যাতে আঙ্গুর বাগান উজাড় না করা হয়। হযরত (সা) বিনা শর্তে তাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন।

তবে সাথে সাথে তায়েফে ঘোষণা করে দিলেনঃ "তায়েফ নগরে যে সমস্ত ক্রীতদাস আছে, তারা যদি বাইরে এসে মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়, তবে তারা মুক্ত।"

এই ঘোষণায় তায়েফ নেতৃবৃন্দ ঘাবড়ে গেল। তারা দেখল ক্রীতদাসরা যদি বিদ্রোহ করে মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়, তাহলে তাদের টিকে থাকা কঠিন হবে।

www.pathagar.com

হযরত (সা) অবরোধ তুলে নিয়ে ছিজরায় ফিরে আসেন, এখানে হাওয়াজিনদের বন্দী নর-নারীরা ছিল।

হযরত ফিরে আসতেই জনৈক রক্ষী এক বৃদ্ধা বন্দিনীকে সাথে নিয়ে এসে হাজির হল। রক্ষী বললো ঃ "হযরত, এই বৃদ্ধা বলছেন, আপনি তাঁর দুধ ভাই। এটা কি সত্য ?"

রক্ষীর কথা শুনে হযরতের মন চলে গেল সুদূর শৈশবের প্রান্তে। বৃদ্ধাকে দেখে তিনি চিনতে পারলেন। এ যে সত্যি তাঁর দুধবোন শায়েমা! শায়েমার সাথে তাঁর শৈশবের অনেক স্মৃতির কথা মনে পড়ল। এই শায়েমাই শৈশবে তাঁকে অনেক আদর করেছেন। দোলনায় দোল খাইয়েছেন। এই শায়েমার কোলেই তিনি অনেক ঘুরে বেড়িয়েছেন।

হযরত শায়েমার বন্ধন মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন। সশ্রদ্ধভাবে তাঁকে কাছে ডেকে বসালেন। হযরত শায়েমাকে মদীনায় যাবার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু শায়েমা তাতে রাজি হলেন না। হযরত তাঁকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

বিষয়টি গোপন থাকার কথা নয়। শায়েমার সাথে হযরত যে হৃদ্যতাপূর্ণ মধুর আচরণ করেছেন, তা শুনে হাওয়াজিনদের মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হল। মুসলমানদের হাতে একেবারে নির্বংশ হবার আশংকা যে সত্য নয়, এমন ধারণা তাদের মনে উদয় হল।

হযরতকে যাচাই করার জন্য তারা দূত মারফত আর একটি প্রস্তাব পাঠাল।

দূত এসে নবীজির কাছে বললো ঃ "এই বন্দীদের মধ্যে আপনার দুধ ভাই, দুধ ভগ্নি, এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। ছোটবেলায় আপনাকে আমরাই লালন-পালন করেছি। এখন আপনি কত উচ্চ, আর আমরা কত তুচ্ছ। অতীতের কথা মনে করে আজ আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করুন।"

হযরত এই আবেদনকে মঞ্জুর করলেন। তিনি বললেন ঃ

"তোমরা কোনটি ফিরিয়ে চাও। স্ত্রী-পুত্রদেরকে না তোমাদের ধন-সম্পদকে?"

দূতরা জবাব দিল ঃ "স্ত্রী-পুত্রদেরকে। স্ত্রী-পুত্রের বিনিময়ে আমরা অন্য কিছু চাই না।"

www.pathagar.com

হযরত তাদেরকে বললেন ঃ "আগামীকাল আমার সাথে সাক্ষাত করবে। আজ আর কিছু বলব না।"

দূতরা একটা ক্ষীণ আশার আলো নিয়ে ফিরে গেল। পরদিন তারা আবার নবীজির দরবারে এসে হাজির হল। তাদের মন আশা-নিরাশার দোলায় দুলছিল। কি জানি, আল্লাহ্‌র নবীর অনুগ্রহ তাদের ভাগ্যে জোটে কিনা! আল্লাহ্‌র নবী তাঁর সাহাবীদের মত নিয়ে কাজ করতেন। শূরা বা পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। সে মূলনীতি নবীজি অনুসরণ করতেন।

সাহাবীদের কাছে নবীজি বললেন ঃ "এদের কাছে আমি চির ঋণী। আমার ইচ্ছা বন্দীদেরকে বিনাপণে মুক্তি দেই। তোমাদের মত কি?"

নবীজির মনের অবস্থা সাহাবীরা বুঝতে পারলেন। তা ছাড়া দয়া ও প্রেমের নবীকে তাঁরা ভালভাবেই জানতেন। সাহাবীরাও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার শিক্ষা পাননি। তাঁরা নবীজির প্রস্তাবে সন্তুষ্ট চিত্তে মত দিলেন।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে একের পর এক শত্রুতা করেও হাওয়াজিনদের বন্দীরা বিনাপণে মুক্তি পেল। তারা আনন্দে আত্মহারা হল। এতবড় সুবিধা তারা আশা করতে পারে নি। আল্লাহ্‌র নবী (সা) যে তাদের ধ্বংস কামনা করেন না; তৌহিদের আদর্শে সকল মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান, হাওয়াজিনদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হল।

হযরতের নিঃশর্ত ক্ষমার মাহাত্ম্যে হাওয়াজিন গোত্রের নেতা মালিক-এর মনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল। এতদিন ধরে অজ্ঞতার কারণে হযরতের বিরুদ্ধে শত্রুতা করার জন্য সে অনুতপ্ত হল। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তার অনুশোচনা শুরু হল। গোত্র নেতা দ্রুত ছুটে এলেন আল্লাহ্‌র নবীর কাছে। তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে সদলবলে সবাই ইসলাম গ্রহণ করল।

ইসলাম গ্রহণের পর এই দুঃসাহসী যোদ্ধা বেদুঈন গোত্রটি সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্র নিয়ে তায়েফবাসীদের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করল। আল্লাহ্‌র কি মহিমা! মাত্র ক'দিন আগেও যারা ইসলাম বিনাশ করার জন্য সক্রিয় ছিল, তারাই এখন ইসলামের শত্রুদের হামলা থেকে ইসলামকে হেফাজতের মহৎ সংগ্রামে সক্রিয় হয়েছে!

www.pathagar.com

হাওয়াজিনদের দুশমনির ফলে তায়েফবাসীরা ভীষণ বিপদে পড়ল। অবস্থা এমন হল যে, তায়েফবাসীদের ঘরের বের হওয়াই এক প্রকার অসাধ্য হয়ে পড়ল। এভাবে মুসলমানদের আপন শক্তিক্ষয় ছাড়াই তায়েফবাসীরা নিজেদের ঘরের শত্রুদের মুকাবিলা করতে হিমসিম খেতে লাগল। তারা তাদের গৃহপালিত পশুগুলোকে নিয়ে বিপাকে পড়ল। হাওয়াজিনরা কিছুদিন আগে তাদেরই মিত্র ছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। এখন হাওয়াজিনদের মুকাবিলা করাই তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। ঘরে-বাইরে দু'দিক থেকেই তারা চাপের সম্মুখীন।

একদিকে বাপ-দাদার আমলের পৌত্তলিক ধর্মের আকর্ষণ, আর একদিকে তৌহিদের উদাত্ত আহবান, এর মাঝে কোন্‌টা তারা গ্রহণ করবে ? কিন্তু মিথ্যার শেকড় তাদের মনে এতটা দৃঢ়মূল হয়েছে যে, সত্যের কচি কিশলয় সেখানে শেকড় গাড়তে পারছিল না। তায়েফবাসীদের শত্রুতার কোন ইতি হল না। তারা জাহেলিয়াতের অন্ধকারেই পথ হাতড়ে ফিরতে লাগল।

তায়েফের মাটিতে আরও রক্ত

হিজরতের আগে একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফে গিয়েছিলেন সত্যের আহবান নিয়ে। তায়েফবাসীরা নবীজিকে যে শুধু প্রত্যাখানই করেছিল, তাই নয়। তারা নবীজির উপর ভীষণ অত্যাচার করে তাঁর পবিত্র দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। নবীজির শরীর থেকে তপ্ত রক্ত ঝরলো তায়েফের শুকনো মাটিতে।

তায়েফের তৃষার্ত মাটির বুঝি আরও রক্তের প্রয়োজন ছিল। তাই তায়েফবাসীদের অন্ধ বিদ্বেষ ও হিংস্রতার কাছে আরও একজন মর্দে মু'মিনকে জীবন দিতে হলো। সত্যের পথে শাহাদতবরণকারী এই নির্ভীক মুজাহিদের নাম ওরওয়া।

হুদায়বিয়ার সন্ধি রচিত হবার সময় তায়েফের সরদার ওরওয়া হযরতের সাথে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই সত্যপ্রেমিক ব্যক্তিটির ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্তটিকে তার গোত্রের লোকজন সুনজরে দেখতে পারেনি। ওরওয়ার

www.pathagar.com

মনে যে গোমরাহীর চিরন্ধ্র অন্ধকার জমাট বেধেছিল এতকাল, তৌহিদের বিদ্যুৎ ঝলকে তা কেটে গেল। কিন্তু তার গোত্রের লোকজনের মধ্যে পৌত্তলিকতার অভিশাপ আরও বেড়ে গেলো। তাছাড়া তাদের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুনও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। ওরওয়ার প্রতি তাদের মন ছিল সিংহা ও ঘৃণায় ভরপুর।

ওরওয়া স্ব-গোত্রীয়দের এই মনোভাবের কথা জানতেন। তবু তিনি তার গোত্রের অবোধ ও অজ্ঞ লোকদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। সত্য পথের দিশা দেবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন।

তিনি হযরতের কাছে গিয়ে বিনীতভাবে আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন; আমি তায়েফে গিয়ে আমার দেশবাসীর মধ্যে ইসলাম প্রচার করবো।" তায়েফের পৌত্তলিকদের নিষ্ঠুরতার কথা হযরত ভাল করেই জানতেন। সত্য প্রচারে ওরওয়ার আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে একদিকে হযরত আনন্দিত হলেন। কিন্তু ওরওয়ার পরিণতির কথা চিন্তা করে তিনি আবার শংকিত হলেন।

হযরত (সা) তবু ওরওয়ার দীন প্রচারের উৎসাহকে অবদমন করে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ওরওয়াকে বললেন ঃ "দিন প্রচার করতে চাও তো ভাল কথা। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, তোমার আত্মীয়েরা তোমাকে হত্যা করে ফেলবে।"

ওরওয়ার মনে তখনও প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর দেশবাসী তাঁকে আগের মতই শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। তাই তিনি বললেন ঃ "দেশবাসী আমাকে খুব ভালবাসে। আশা করি তারা আমার কথা শুনবে। আর তারা যদি আমাকে হত্যাই করে, তবে আমার কোন দুঃখ থাকবে না। সত্যের জন্য হাসি মুখেই আমি সে মরণ বরণ করবো।"

হযরত (সা) দিব্য চোখে ওরওয়ার শাহাদতের দৃশ্য দেখছিলেন। তাই তিনি আর শাহাদতের জন্য পাগলপারা এই ঈমানদীপ্ত মুসলমানটিকে বাধা দিতে পারলেন না।

ওরওয়া সত্যের বাণী বহন করে তায়েফের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পথে তাঁর অনেক সময় কেটে গেছে। সন্ধ্যার দিকে তিনি তায়েফে পৌছলেন। ক্লান্তি

www.pathagar.com

ও অবসাদের কথা ভুলে তিনি দেশবাসীর কাছে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ব্যক্ত করলেন। আর আহবান জানালেন মিথ্যার জাল ছিন্ন করে সবাই যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর আনুগত্য স্বীকার করে।

ওরওয়ার প্রতি তায়েফবাসীদের মন পূর্ব থেকেই বিষাক্ত ছিল। এবার তাদের চাপা ক্ষোভ বিদ্রোহের রূপ নিল।

স্বদেশবাসীর এই বিদ্রোহ ওরওয়াকে কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত করতে পারল না। পরদিন পূর্ব আকাশে ভোরের স্বচ্ছ আলোক রেখা উদ্ভাসিত হয়ে উঠার সাথে সাথেই ওরওয়া ছাদের উপর উঠে উচ্চস্বরে আযান দিলেন। আযানের সে ধ্বনি ছড়িয়ে গেল তায়েফের মরু দিগন্ত।

ওরওয়ার প্রতি এবার তায়েফবাসীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তারা এই অকুতোভয় ঈমানদীপ্ত মুসলমানের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত কুকুরের মত হয়ে উঠলো।

ওরওয়া যে তাদের এককালের গোত্র নেতা ছিলেন, তারা এটাও ভুলে গেল। ক্রোধোন্মত্ত তায়েফবাসীর সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল ওরওয়ার উপর। তারা সম্মিলিতভাবে এলোপাতাড়ি তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। অসংখ্য তীর এসে ওরওয়ার দেহকে ঝাঁঝরা করে দিল। পবিত্র আযানের ধ্বনি তখনও ওরওয়ার মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছিল। আযানের সুমধুর সুরে তিনি নির্বিকারচিত্তে আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা করছিলেন। সে অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তাঁর কণ্ঠের আযানের সুরধ্বনি যেন আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনি তুললো। তায়েফের ঊষর মরুর মাটি আর এক ভক্ত মুসলমানের রক্তে সিক্ত হলো।

এমনি করেই সত্যপ্রেমিক মর্দে মুজাহিদ ওরওয়া ইসলামের জন্য শাহাদতবরণ করলেন। তায়েকের পাষাণ দিল, সত্যবিমুখ লোকগুলো উৎকট পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়লো।

ওরওয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত থেকেও তাঁর অবোধ দেশবাসীর শুভবুদ্ধি কামনা করে গেছেন। তিনি অস্পষ্টক্ষীণ কণ্ঠে বলে গেলেন ঃ

"হে আমার দেশবাসী! তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি এই রক্তদান করলাম। বন্ধুরা আমার! তোমাদের ঈমান আসুক! বিদায়।"

আত্মত্যাগের এই মহৎ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

www.pathagar.com

ওরওয়া জীবন দান করে হয়তো তাঁর দেশবাসীকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে গেলেন।

ওরওয়ার শাহাদতের সংবাদ যথাসময়ে নবীজির কাছে পৌঁছলো। নবীজি খবর শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তিনি ওরওয়ার রূহের মাগফিরাত কামনায় মুনাজাত করলেন। সাথে সাথে তিনি বললেন ঃ

"ওরওয়াকে নবী আল-ইয়াসিনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ইয়াসিন লোকদেরকে আল্লাহ্‌র নামে আহবান করতে গিয়ে তাদের হাতেই শহীদ হন।"

এভাবে নবীজি ওরওয়ার শাহাদতকে নবীর আত্মদানের সাথে তুলনা করে তাঁর মর্যদাই বাড়িয়ে দিয়েছেন। এত মর্যাদার মৃত্যু ক'জনের ভাগ্যে জোটে?

ওরওয়ার রক্তদান বিফলে যায়নি। প্রবল উত্তেজনা ও মুসলমানদের প্রতি সীমাহীন প্রতিহিংসার উন্মত্ততার মধ্যেই তায়েফবাসীরা ওরওয়াকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল। এই ঘটনার পর ক্রমে যখন তাদের উত্তেজনা প্রশমিত হলো, তখন তাদের মধ্য কিছুটা আত্ম-জিজ্ঞাসা জাগলো। ওরওয়া তো কোন অন্যায় দাবি করেননি? কারো সম্পদও তো তিনি আত্মসাৎ করেননি। তিনি তো মাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর উপর ঈমান এনেছেন। আর সেই সত্যের আহবান প্রচারের বুকভরা আশা নিয়ে দেশবাসীর কাছে এসেছিলেন। কিন্তু সামান্য এই কারণেই কি ওরওয়ার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে? এই জিজ্ঞাসাগুলো তায়েফবাসীদের মনে প্রবল হয়ে উঠলো।

তাছাড়া ওরওয়া তো তাদেরই নেতা ছিলেন। তাঁর হৃদয়-মন যখন সত্যের স্বীকৃতিতে উচ্চকণ্ঠ হয়েছে তখন তারাই বা গোমরাহীর অন্ধকারে জীবনের আলো হারাবে কেন? ওরওয়া তো পার্থিব লোভ-লালসার বশে ইসলাম গ্রহণ করেননি। যদি তাই হতো, তাহলে নিরস্ত্র ওরওয়া এমন করে নিঃস্বার্থভাবে জীবন দিতে পারতেন না।

তায়েফবাসীরা বিবেকের তাড়নার কাছে এবার আত্মসমর্পণ করলো। এই প্রশ্নে তাদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি দেখা দিল। অনেকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলো। ফলে তায়েফবাসীদের শক্তি ক্রমশ খর্ব হতে থাকলো।

এদিকে তায়েফবাসীদের এককালের সহযোগী মিত্র হাওয়াজিন গোত্র

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণ করায় তারা আগেই বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল। হাওয়াজিন গোত্রের নও মুসলিমদের শত্রুতায় তায়েফবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেল। এখন অস্তিত্ব রক্ষাই তাদের দায় হয়ে উঠলো। তারা শান্তি স্থাপনের জন্য উদগ্রীব হলো। তারা তাদের গোত্রের দু'জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে হযরত (সা)-এর কাছে পাঠালো।

মদীনায় তখন ইসলামী রাষ্ট্র কাঠামোটি অত্যন্ত মজবুত ছিল। আর আল্লাহ্‌র নবী (সা) স্বয়ং সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। শান্তির প্রস্তাব নিয়ে তাঁরই দরবারে আজ তায়েফ সরদাররা ছুটে চলছেন।

প্রতিনিধি দলটি মদীনায় পৌঁছলে নবীজি তাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। অসীম উদারতায় তিনি এই পৌত্তলিক সরদারদের মসজিদে নববীতেই থাকতে দিলেন। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সদর দফতর ছিল এই মসজিদে নববী। আজকালকার মত তখন বিদেশী মেহমানদের জন্য রাষ্ট্রীয় মেহমানখানা ছিল না। তাই মসজিদে নববীই ছিল সকল রাষ্ট্রীয় কাজের কেন্দ্রস্থল।

তায়েফ সরদাররা দিনকয়েক ধরে মসজিদে নববীতে অবস্থান করলেন। ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্য ও সৌন্দর্যের কথা শুনলেন। মুসলমান সমাজের অপূর্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, নিয়ম-নিষ্ঠা ও নেতার প্রতি অপূর্ব আনুগত্য দেখে তারা অভিভূত হলো। মসজিদের এক কোণে বসে তারা মুসলমানদের নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার দৃশ্য দেখে আরও মুগ্ধ হলেন। কিন্তু তবু যেন তাদের মনের পৌত্তলিক শয়তানটা তাদেরকে শেষবারের মত বিভ্রান্ত করতে চাইলো।

ইসলামের প্রতি ঈমান না এনে তাদের উপায় ছিল না। রাজনৈতিক কারণই যেন তাদেরকে ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অতিমাত্রায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই যত না ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল তাদের ইসলামের শক্তিকে ভয়। ফলে তারা দ্বিধা- সংকোচের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করলো।

কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার কিছুদিনের মধ্যেই তাদের মনে পুরনো শয়তানিটা জেগে উঠলো। এতকাল ধরে যে সব মিথ্যা দেবতার উপাসনা তারা করেছে, মুসলমান হবার ফলে সেই সব দেবতাদের ভেঙ্গে ফেলতে হবে? এতবড়

www.pathagar.com

নির্মমতা তাঁরা কিভাবে করবে? মনের এই দুর্বলতার কথা তারা হযরত (সা)-এর কাছে খুলে বললো। তারা বিনয়ের সাথে বললোঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ্। তায়েফবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করবে বলেই আমরা আশা করছি। কিন্তু আমাদের পক্ষে একই সাথে সবগুলো বিধি-নিষেধ পালন করা অসম্ভব। তাই আমাদের অনুরোধ, আমাদের দেবতাগুলোকে যাতে আমরা আরও তিন বছর রাখতে পারি এবং নামায পড়ার দায় থেকে মুক্তি পাই, দয়া করে সে ব্যবস্থা করুন।"

নবদীক্ষিত তায়েফবাসীদের কথা শুনে নবীজি তাজ্জব বনে গেলেন।

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন ঃ

"অসম্ভব! ইসলাম তৌহিদের ধর্ম। ইসলামের তৌহিদে বিশ্বাস ও মূর্তি একসাথে থাকতে পারে না। যে মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করবে, সে মুহূর্তে তোমাদেরকে পৌত্তলিকতা বর্জন করতে হবে। তিন বছর তো দূরের কথা, এক দিনের কিংবা এক মুহূর্তের অবসরও তোমাদেরকে দেয়া হবে না। আর নামাযের কথা বলছ? নামায অপরিহার্য। নামাযই তো ইসলামের পরিচয়। সকল কল্যাণের উৎসই হচ্ছে নামায। এই নামায তোমরা বর্জন করতে চাও?"

নবীজির এই দৃঢ় জবাবের পরে তায়েফের প্রতিনিধিগণ আর কোন কথা বাড়াতে সাহস পেল না। প্রতিনিধি দল দেখলো কথা বাড়িয়ে আর কোন লাভ নেই। তারা বুঝলো, ইসলাম পৌত্তলিকতার সাথে তিল পরিমাণও আপস করে না। ইসলামের আবির্ভাবই হয়েছে পৌত্তলিকতা নির্মূল করার জন্য।

তারা বললো, অন্য প্রতিমাগুলোকে আমরাই ধ্বংস করতে পারবো। তবে সমস্যা হচ্ছে, অশিক্ষিত জনসাধারণ ও স্ত্রীলোকদের নিয়ে। বিশেষ করে 'লাত' দেবতার মূর্তিটি ভাঙ্গতে গেলে সবাই কান্নাকাটি করবে। তাই এই কাজটি আপনাদেরই করতে হবে।

তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী দু'জন সুযোগ্য প্রতিনিধি তাদের সাথে দেয়া হলো। এদের একজন হলেন মুগীরা এবং অপরজন হলেন আবূ সুফিয়ান। এককালে এরা দু'জন ছিলেন তায়েফবাসী পৌত্তলিকদের বন্ধু অভিভাবক। মুসলমান হবার পরে এখন তারাই হলেন পৌত্তলিকতা নির্মূল করার প্রথম সারির উদ্যোগী ব্যক্তি। সত্যের প্রতি মানুষের আস্থার কারণে ইতিহাস এমনি করেই নতুন রায় লেখে।

www.pathagar.com

দেশে ফিরে এসে প্রতিনিধিদল স্বদেশবাসীদের অধিকাংশকেই ইসলামে দীক্ষিত করলেন। এবার দুঃসাহসী মুগীরা কুঠার দিয়ে আঘাত করে 'লাত' দেবতার মূর্তিটিকে টুকরো করে ফেললেন। অজ্ঞ নর-নারীরা কেঁদে কেঁদে অস্থির। মুগীরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন। 'আল্লাহ্ আকবর- আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।'

তায়েফের রক্তভেজা পবিত্র মাটিতে তৌহিদের ভিত্তি এভাবেই দৃঢ় হলো। নবীজির পবিত্র রক্ত এবং ওরওয়ার রক্ত বৃথা যায়নি।

এ বছরই আর একটি ঘটনা ঘটলো। মদীনার খাজরাজ নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিলো মুনাফিকদের সরদার। বাইরে সে মুসলমানদের মিত্র বলে জাহির করলেও আসলে সে ছিল মুসলমানদের একজন কট্টর দুশমন। বাইরে ভালো মানুষের ভান করলেও সে ইহুদী ও ইসলামের তৈরি দুশমনদের সাথে গোপন সম্পর্ক রাখত।

তায়েফবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করার বছরই আবদুল্লাহ্ বিন উবাই মারা যায়। মুসলমানদের অগ্রযাত্রার পথ থেকে বর্ণচোরা এই ব্যক্তিটির চিরবিদায় গ্রহণের ফলে মুসলমানরা অনেকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। কেননা, আবদুল্লাহ বিন উবাই জীবনে মুসলমানদের যথেষ্ট দুঃখ দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র নবী সেই মুনাফিক বক্তির মৃত্যু সংবাদ শুনেই নিজের চাদরখানা পাঠিয়ে দেন। নবীজি নিজে কফিনের সাথে গোরস্তান পর্যন্ত গমন করেন। এভাবে তিনি পরম শত্রুর প্রতিও সদয় ব্যবহার করলেন। নবম হিজরীর শেষ ভাগে হজ্জ মওসুমে হযরত খাঁটি ইসলামী কায়দায় হজ্জ শিক্ষা দেবার জন্য আবূ বকরের নেতৃত্বে তিনশত মুসলমানের এক কাফিলা মক্কায় পাঠালেন।

এরপরই পবিত্র কুরআনের আয়তের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক পৌত্তলিকদেরকে পবিত্র কাবা শরীফে হজ্জ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে মুসলমানরা সচেতন ছিলেন। হযরত (সা)-এর একটি হুকুমনামা সহ হযরত আলী (রা)-কে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। হজ্জের শেষে সমবেত হজ্জ যাত্রীদের সামনে হযরত আলী (রা) নবীর নির্দেশটি পাঠ করে সকলকে শোনান।

সে নির্দেশে বলা হলঃ এখন হতে কোন পৌত্তলিক আর কাবা শরীফে হজ্জ করতে পারবে না। কাবা ঘরে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হলো।

www.pathagar.com

পৌত্তলিকরা পরাজয়ের বেদনা ও আক্রোশ নিয়ে আল্লাহ্‌র সৈনিকদের এই ঘোষণা শুনলো। কিন্তু তাদের আর কিছু করার ছিল না।

এমনি করে দীর্ঘদিন পরে আল্লাহ্‌র ঘর আবার আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাহ্‌দের দখলে আসলো। পৌত্তলিকরা চিরদিনের জন্য কাবাঘর থেকে বিতাড়িত হলো।

সমগ্র আরবে তৌহিদের অর্ধচন্দ্র খচিত পতাকা পতপত করে উড়তে লাগলো। পৌত্তলিকতার শক্ত ভিতটা এমনিভাবে ধসে পড়ল। ইবরাহীম (আ)-এর প্রতিষ্ঠিত কাবাঘর আবার তাঁরই উত্তরসুরি নবী মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে পৌত্তলিকদের দখল থেকে মুক্ত হলো।

রোমানদের দর্প চূর্ণ

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে মহানবী (সা) সত্যের দাওয়াত সহ দূত পাঠিয়েছিলেন। সম্রাটের দরবারে নবীজির দূত গিয়ে তাঁর পত্র হস্তান্তর করেছিলেন। সম্রাট হিরোক্লিয়াস নবীজি সম্পর্কে কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ানের কাছে যে বিবরণ শুনেন, তাতেই তিনি স্থির নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, নবীজিই ইঞ্জিলের প্রতিশ্রুত শেষ নবী। তখন আবূ সুফিয়ান ছিলেন পৌত্তলিকদের সরদার।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস প্রকাশ্য দরবারেই তখন প্রায় ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন যে, ইসলামই সত্য দীন এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র প্রেরীত পুরুষ। কিন্তু রাজদরবারের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালী খৃস্টান পুরোহিতদের বিরাগভাজন হবার ভয়ে সম্রাট সত্যের স্পষ্ট নিদর্শনকেও অবজ্ঞা করেছিলেন। কেননা, এটা করলে বিভ্রান্ত খৃস্টান পাদ্রীদের চরম বৈরীতা তাকে সহ্য করতে হতো। আর এতে করে হয়তো তাকে ক্ষমতা হারাবার ঝুঁকিও নিতে হতো এটাই ছিল তাঁর ভয়। রোমের সম্রাট ছিলেন তখনকার দিনে খৃস্টান জগতের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। খৃস্টান পাদ্রীরা ফতোয়া দিত যে, সম্রাটই হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। সুতরাং তাদেরকে নির্বিচারে মেনে চলাটা প্রজাদের ধর্মীয় পবিত্র কাজ। এভাবে পাদ্রীরা সম্রাটের নিরাপত্তা বিধান করতো। সুতরাং পাদ্রীদের ক্ষিপ্ত করে কোন সম্রাটের

www.pathagar.com

পক্ষেই আর ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। রোম সাম্রাজ্যে খৃস্ট ধর্মের পাদ্রীগণ ছিল সম্রাটের সহযোগী শক্তি।

ইঞ্জিলে শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও খৃস্টান পাদ্রীরা কেবল আত্ম-অহমিকায় অন্ধ হয়ে নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে। এর ফলে ঈসা (আ)-এর অনুসারী বলে দাবিদার খৃস্টানদের মধ্যে ইসলাম ও তার অনুসারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ দানা বেঁধে ওঠে। শত্রুতার বীজ এভাবেই উপ্ত হয়। ফলে খৃস্টান ধর্মও কতকটা মুসলিম বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে বেঁচে থাকে। তবে খৃস্ট ধর্মেও মূলত মানব জীবনের সমস্যাবলীর সর্বকালীন পূর্ণাঙ্গ সমাধান ছিল না। ঈসা (আ) সমসাময়িককালের মানুষের নৈতিকতা উন্নয়নেই সবিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। সুতরাং আধুনিক জীবনাত্রার জটিল সমস্যার সমাধান ঈসায়ী ধর্মে খুঁজে পাওয়ার কথা ছিল না। উপরন্তু খৃস্টান পাদ্রীরা ঈসায়ী ধর্মকে নিজেদের মনের মতো করে ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছে। ফলে খৃস্টানদের ধর্মের পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা আর থাকল না।

ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে খৃস্টান পাদ্রীরা সচেতন থেকেও কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ, অন্যায় অহংকার ও জাতি-বিদ্বেষের কারণে বিকৃত ধর্মাচারের মধ্যেই ডুবে থাকলো। এমন কি, তারা ইসলামের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য সম্রাটকে প্ররোচিত করছিল। সম্রাট হিরাক্লিয়াস একদিকে যাজকদের মনঃতুষ্টির জন্য এবং অন্যদিকে মুসলিম বিরোধী প্রচারণার আড়ালে খৃস্টান জগতের ঐক্যের আড়ালে নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত করার উদ্দেশ্যেই মদীনার নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করার ফন্দি আঁটতে লাগলেন।

সম্রাট হিরাক্লিয়াসের হাবভাব যে ভাল নয়, সেটা মুসলমানরা আগে থেকেই জানতেন। এক্ষণে গোয়েন্দা মারফত মুসলমানরা খবর পেলেন যে, সম্রাট হিরাক্লিয়াস মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অবশ্য রোম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির সময় থেকেই রোমানদের মধ্যে আরব দেশ জয় করার বাসনা জেগেছিল। মূতা অভিযানে তাদের ব্যর্থতাও তাদেরকে পীড়া দিচ্ছিল। এই ব্যর্থতা রোমানদের আত্মমর্যাদার উপর এক মারাত্মক আঘাত হানে। হযরত মুহম্মদ (সা)-এর নেতৃত্বে নব বিকশিত একটি অশ্রুতপূর্ব আরব মুসলিম শক্তির

www.pathagar.com

কাছে ছোটখাটো ব্যর্থতাও তাই খৃস্টান জগতের চোখে ছিল বিরাট বেদনাদায়ক ঘটনা। তারা নবীণ মুসলিম শক্তিকে পর্যুদস্ত করার সুযোগ খুঁজছিল।

সিরিয়া ছিল তখন রোমানদের দখলে। আর সিরিয়ার অধিকাংশ মানুষ ছিল খৃস্ট ধর্মের অনুসারী। সম্রাটের নির্দেশে এই সিরিয়া থেকেই প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করা হলো। ছোটখাটো বহু ইসলাম বিদ্বেষী গোত্র থেকেও রোমানরা যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করলো।

রোমানদের মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হলো। তারা ভাবলো, একদিকে ইসলামের নতুন শক্তি খৃস্টানদের শেকড় কাটতে চাচ্ছে। আর অন্যদিকে মদীনার বাড়ন্ত রাষ্ট্র শক্তিটি যেভাবে দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে, তাতে খৃস্টান শাসিত এলাকারই সমূহ বিপদ হতে পারে। মুসলমানদের শক্তি এভাবে অপ্রতিহত গতিতে বাড়তে থাকলে রোম সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাই বিঘ্নিত হবে। তাছাড়া রোমানদের নিয়ে বিশ্বব্যাপী তখন একচ্ছত্র শক্তির স্তুতি চলছিল, সেটাও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এই আশংকায় রোমানরা জাতীয় পর্যায়ে বিপুল যুদ্ধ আয়োজন শুরু করে দিল। এই যুদ্ধ প্রস্তুতির সাথে যুক্ত হলো মুসলিম বিদ্বেষী ধর্মান্ধ যোজক শ্রেণীর সহযোগিতা এবং প্রচারণা ও প্ররোচনা। ফলে খৃস্টান জগত জুড়ে ইসলামকে নির্মূল করার একটা উন্মাদনা শুরু হলো। এর প্রকাশ ঘটে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে।

হিরাক্লিয়াসের এই যুদ্ধ প্রস্তুতি মুসলমানদের বীরত্বের প্রতি ছিল একটি ভ্রূকুটি। মহানবী (সা) রোমানদের অহংকার চূর্ণ করার শক্তি সঞ্চয়ের নির্দেশ দিলেন। ইসলামে দীক্ষিত আরবের সকল গোত্রের কাছে তিনি সৈন্য ও রসদ দিয়ে সাহায্য করার আবেদন জানালেন। এই যুদ্ধ যে মুসলমানদের সামগ্রিক অস্তিত্বের প্রতি হুমকি সেটাও তিনি সকলকে বুঝিয়ে দিলেন।

নবুয়তের সূচনা থেকে নবীজি সীমাহীন বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-দুর্গতি লাঞ্ছনা স্বীকার করে আজ জীবন সায়াহ্নে এসে বিজয়ের পূর্ণতায় পৌঁছেছেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁকে অসংখ্য শত্রুর সাথে মুকাবিলা করতে হয়েছে। মক্কার পৌত্তলিক কুরাইশরা চেয়েছিল অংকুরেই ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে। কিন্তু তারা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। মক্কার মুনাফিক ও ইহুদীদের অবিরাম চক্রান্তও মুসলমানরা ব্যর্থ করে দিয়েছে। এ ছাড়া আরও অনেক পৌত্তলিক

www.pathagar.com

গোত্রের ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করে নবীজি ইসলামকে মানব জাতির সামনে একটি বিজয়ী জীবন ব্যবস্থা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। খৃস্টানরা এর আগেও একবার চেষ্টা করেছিল, ইসলামের উজ্জ্বল আলো নিভিয়ে দিতে। কিন্তু তাতে তারা সফলকাম হয়নি। তাই খৃস্টানদের এবারকার আয়োজন ছিল ব্যাপকতর এবং তাদের প্রতিজ্ঞা ছিল কঠিন। যে কোন উপায়েই হোক। নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের বিনাশ তাদের করতেই হবে।

মহানবী (সা) রোমান খৃস্টানদের মদীনা আক্রমণের কোন সুযোগ দিতে চাইলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, মদীনা থেকে সামনে এগিয়েই রোমানদের মুকাবেলা করতে হবে। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে, সিরিয়া অভিযানে যেতে হবে।

মুসলমানরা কোনদিনই শত্রুর বিপুল শক্তি ও বিপুল যুদ্ধ সরঞ্জামকে পরোয়া করেনি। ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর কাছে বড় বড় শত্রুবাহিনী নাস্তনাবুদ হয়ে গেছে। এ ইতিহাস মুসলমানরা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ জ্বলন্ত ইতিহাস মুসলমানদের সামনে রয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর উপরই আল্লাহ্‌র শক্তি ও সার্বভৌমত্ব ক্রিয়াশীল। জয়-পরাজয় কখনও মানুষের আদালতে নির্ধারিত হয় না। তা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এখ্‌তিয়ারে। এটি মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস। সত্যের পথে দৃঢ় ও অবিচল আল্লাহ্‌র সৈনিকরা কঠিন পরিস্থিতিতেও যদি ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় আল্লাহ্‌র অসীম শক্তির উপর নির্ভর করতে পারে অকুণ্ঠ চিত্তে, তাহলে আল্লাহ্ অবশ্যই সেই সত্যের মুজাহিদদেরই জয়ী করবেন। রোমানদের অন্যায় আক্রমণ প্রতিহত করার এই জিহাদে আল্লাহ্ পাকের গায়েবী মদদ যে মুসলমানদের পক্ষেই রয়েছে, এ ব্যাপারে মুসলমানরা ছিলেন স্থির নিশ্চিত।

দেখতে দেখতে প্রায় চল্লিশ হাজারের এক বিরাট মুসলিম বাহিনীর সমাবেশ ঘটলো। এদের মধ্যে দশ হাজার ছিল অশ্বারোহী।

নবীজি এ জিহাদের ব্যয়ভার বহনের জন্য সকলের কাছে সাধ্যানুযায়ী সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। এ আবেদনে আশ্চর্য রকম সাড়া পাওয়া গেল। আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর সন্তুষ্টির জন্য মুসলমানদের মধ্যে

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতা শুরু হলো। অর্থ, সোনার অলংকার, মাল-সামান, উট, বকরী, ঘোড়া; যার যা সামর্থ্য ছিল তা নিয়ে নবীজির দরবারে এসে হাজির হলেন। হযরত উমর (রা) তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক যুদ্ধ তহবিলে দান করে দিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর সবকিছু উজাড় করে দিলেন। আল্লাহ্‌র নবী জানতে চাইলেন, নিজের জন্য তিনি ঘরে কি রেখে এসেছেন!

আবূ বকর (রা) জবাব দিলেন ঃ "আল্লাহ্ আর তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।" ঈমানের পরীক্ষায় এবারও হযরত আবূ বকর (রা) সকলকে ছাড়িয়ে গেলেন।

হযরত উসমান (রা) ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি এক হাজার উট ও সত্তরটি ঘোড়া এবং এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন। সত্যের পথে কি সীমাহীন আত্মত্যাগ!

আরও অসংখ্য মুসলমান এসে যুদ্ধে যাবার জন্য আরজ করলেন। উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম ও রসদ-পত্রের অভাবে তাঁদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নেয়া সম্ভব হলো না। ব্যর্থতার এই বেদনায় অনেকেই অবোধ বালকের মত কাঁদতে শুরু করলেন। এতবড় একটি মহৎ কর্তব্য থেকে বঞ্চিত থাকলে তাদের ঈমান যে পূর্ণ হবে না, এই অনুভূতি তাদেরকে নাড়া দিল। শেষ পর্যন্ত নবীজি তাদেরকেও সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নিলেন।

গোটা বাহিনীর অধিনায়ক হলেন স্বয়ং আল্লাহ্‌র দোস্ত সিপাহসালারদের সিপাহসালার প্রিয় নবী (সা)। এই জিহাদই ছিল তাঁর জীবনের শেষ জিহাদ। চল্লিশ হাজার মুসলিম সৈন্যের এই কাফিলা সুশৃংখলভাবে দৃপ্ত পদভারে এগিয়ে চলছেন সম্মুখ সমরে।

হযরত আলী (রা)-এর উপর মদীনা রক্ষার ভার অর্পিত হলো। ফলে তিনি এই অভিযানে অংশ নিতে পারলেন না।

গ্রীষ্মের তপ্ত দাবদাহ উপেক্ষা করে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে হযরত (সা) সিরিয়ার তাবুক প্রান্তরে এসে উপস্থিত হলেন।

বিরাট এলাকা জুড়ে মুসলমান সৈনিকদের ছাউনী পড়লো। এতবড় বাহিনী দেখে রোমানদের চোখ কপালে উঠলো। তদের ধারণা ছিল, একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে মুসলমানরা তাদের আক্রমণের সামনে খড়কুটার মত উড়ে যাবে।

www.pathagar.com

কিন্তু মুসলমানরা যেভাবে বিশাল বাহিনী নিয়ে রোমানদের মুকাবিলায় তাবুক প্রান্তরে অগ্রসর হয়ে এসেছে, তাতে রোমানদের পূর্ব ধারণা ভেঙ্গে গেল। তারা প্রমাদ গুণলো। তারা ভাবলো, চল্লিশ হাজার সৈন্য যখন মুখোমুখি যুদ্ধের জন্যই এগিয়ে এসেছে, তখন অন্ততপক্ষে আরও বিশ হাজার সৈন্য মুসলমানরা রিজার্ভ রেখে এসেছে। এই বিরাট বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা যে সহজ ব্যাপার ছিল না, এটা তারা ক্রমে উপলব্ধি করলো।

মহানবী (সা)-এর নেতৃত্বের ঐশ্বর্য এবং মুসলমানদের ঈমানী শক্তি সম্পর্কে রোমানরা একেবারেই খবর রাখত না, এমন নয়। তবে এত অল্প সময়ে এত বিশাল সেনাদল যে তারা গঠন করতে পারবে, এটা ছিল তাদের ধারণার অতীত। তারা ভাবলো, যে ব্যক্তির নির্দেশে পঞ্চাশ হাজারের বেশি লোক অকাতরে জীবন দিতে পারে, যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁকে পরাজিত করা তো সম্ভব নয়।

রোমান সৈন্যরা ছিল বেতনভুক। নিছক চাকুরী হিসেবেই তারা যুদ্ধকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার সৈন্যদের সামনে অর্থনৈতিক স্বার্থের একটি বিরাট টোপ দিয়েছিলেন। তিনি তার বাহিনীর সৈন্যদের এক বছরের বেতন অগ্রিম দিয়েছিলেন।

কিন্তু ঠিক তার বিপরীতে মুসলমানরা কিসের নেশায় যুদ্ধ করতে এসেছে? সত্যবিমুখ একটি শয়তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সত্য রক্ষার এ সংগ্রাম ছিল মুসলমানদের কাছে একটি মহত্তর ইবাদত। আর তাই রোম সম্রাট যখন তার সৈনিকদেরকে আর্থিক সুযোগ দিয়ে বশে আনলো, তখন আল্লাহ্‌র নবী (সা) মুসলমানদের কাছে আল্লাহ্‌র রাহে জান ও মাল উৎসর্গ করার আহবান জানালেন। আর সে আহবানে সাড়া দিতে গিয়ে মুসলমানদের মধ্যে আত্মত্যাগের কি তীব্র প্রতিযোগিতা।

এমন একটি দুর্জয় সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হবার আগে রোম সম্রাট হাজার বার ভাবতে বাধ্য হলেন। অবলীলায় আল্লাহ্‌র রাহে জীবন কোরবানী দানের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে মুসলমানদের। জগতে মুসলমানরাই একমাত্র 'জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য' বলে তুচ্ছজ্ঞান করতে পেরেছে। আল্লাহ্‌র রাহে জীবন কোরবানী দানের মধ্যেই মুসলমানরা জীবনের পূর্ণতা পায়। এই জীবন দর্শন তো আর কোন জাতিকে এতটা অনুপ্রাণিত করেনি।

www.pathagar.com

রোমান সেনাদল অগ্রসর হয়ে 'বলবন' নামক স্থানে এসে তাঁবু ফেলেছিল। কিন্তু শক্তিধর মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হতে সম্রাট হিরাক্লিয়াস সাহস পেলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন, এ অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনা। সুতরাং হিরাক্লিয়াস তার বাহিনী নিয়ে পিছু হঠে গেলেন। রোমানদের অহমিকা ও শ্রেষ্ঠত্বের বাহাদুরি মুসলমানদের দৃঢ়তার কাছে ধূলায় লুটিয়ে পড়লো।

এমনিভাবেই সত্যের নিশান বরদারদের কাছে অসত্যের দানবীয় শক্তি পরাজিত হয়েছে যুগে যুগে। কেননা, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, অসত্যের বিনাস অবধারিত। এটিই আল্লাহ্‌র দুনিয়ার শিক্ষা।

রোমানদের হাতে মুসলমানদের পতন কামনা করেছিল যারা, এবার সেই সব ইহুদী ও খৃস্টানরা নিরাশ হয়ে পড়লো। বিশেষ করে, তাবুক ও তার আশেপাশের ইহুদী ও খৃস্টান গোত্রগুলো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তাদের একমাত্র ভরসা ছিল রোমান রাজশক্তি। কিন্তু তাদের পশ্চাদপসরণের ফলে ইহুদী-খৃস্টানরা নিজেদেরকে অসহায় ভাবলো। তারা বুঝলো, মুসলমানদের সাথে আর শত্রুতা করে লাভ নেই।

তাদের অনেকে এসে হযরত (সা)-এর বশ্যতা স্বীকার করলো। অনেকে মুসলমান হয়ে গেল। হযরত (সা) তাদেরকে জান ও মালের নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন।

তাবুক বিজয়

তাবুক অভিযানে বিনাযুদ্ধে রোমানদের পরাজয়ের প্রভাব হলো সুদূর-প্রসারী। ইসলামী শক্তি যে একটি অজেয় বিশ্বশক্তি, এবার সেটা প্রমাণিত হলো। রোমানরাই ছিল তখনকার বৃহৎ বিশ্বশক্তি। সমসাময়িক দুনিয়া রোমানদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে হয় রোমানরা গ্রাস করে নিয়েছিল, আর না হয় তারা রোমানদের বশ্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এমন কোন রাষ্ট্রশক্তি তখনকার দিনে ছিল না, যা রোমান সাম্রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারত। কিন্তু ইতিহাসের সেই ধারাকে মুসলমানরাই পরিবর্তন

www.pathagar.com

করে দিল। চিরাচরিত বিশ্বাসের মূলে তারা কুঠারাঘাত হানল। তারা প্রমাণ করলো যে রোমানরা অজেয় নয়। জগতে আর একটি দুর্জয় শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যারা আল্লাহ্‌র শক্তিতে শক্তিমান এবং দুনিয়ার কোন শক্তিকেই তারা পরওয়া করে না। এই শক্তিটিই যে চলমান ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে, সেটা সমসাময়িক জগৎ বিস্ময়ের সাথে অনুভব করলো তাবুকের ঘটনার পরে।

এভাবে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রটির মর্যাদা শতগুণে বেড়ে গেল। এই সাথে মুসলমানদের সম্মানও গেল বেড়ে। তাবুক থেকে ফিরে আসার পরে অসংখ্য গোত্র এসে রাসূল (সা)-এর হাতে বাইয়াত নিতে শুরু করেন। যাদের মনে দুষ্টুমি ও সন্দেহ-সংশয় ছিল, তারা এবার দেখলো যে মুসলমানদের মুকাবিলা করার মত আর কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই। সুতরাং আরবের এই মুসলিম শক্তিটির সাথে বিবাদ করাকে যারা নিজেদের জন্য বিপজ্জনক মনে করলো তারা এসে মুসলমান হতে লাগলো দলে দলে।

এই সময়ই আরবের খ্যাতনামা দানবীর হাতেমতায়ীর পুত্র আবি ইব্‌নে হাতেম মুসলমান হন। হাতেমতায়ী অনেক আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে তিনি ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পাননি।

প্রখ্যাত কুরাইশ কবি কা'ব ইব্‌নে জোহায়েরও এই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। এর আগে কা'ব-এর ভাই তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কা'ব তার জবাবে ইসলাম ও নবীজির বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করে চিঠি লিখেন।

কিন্তু এই কা'বও ইসলামের সত্য-সৌন্দর্যের কাছে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করলো। কবি কা'ব অনুতপ্ত হয়ে নবীজির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। করুণা ও দয়ার সাগর নবীজি কা'বকে ক্ষমা করে দিলেন। কা'ব ছিলেন কবি। তাই কবিত্বের আবেগ দিয়েই তিনি এই ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে একটি 'নাত-এ রসূল' রচনা করে সেটি পাঠ করে শোনালেন। কবি কা'ব যেন তাঁর অন্তরের সবটুকু আবেগ মিশিয়ে নাতটি রচনা করেছিলেন। নাত'টির শেষ দু'টি লাইন হচ্ছে ঃ

"তুমি নূর, ঘুচায়েছ তুমি সারাবিশ্বের আঁধার
আল্লাহ্‌র হাতে তুমি জ্যোতির্ময় মুক্ত তলোয়ার।"

www.pathagar.com

এই নাতটি শুনে নবীজি খুব খুশি হলেন। পুরস্কার হিসেবে নবীজি কবিকে আপন 'খিরকা' দান করলেন। কবি এই মহামূল্যবান পুরস্কারকে জীবনের বড় পাওয়া হিসেবে গ্রহণ করলেন।

খৃস্টানদের প্রতি উদারতা

নবীজি ছিলেন নিখিল বিশ্বের সকল মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ। যে সব জাতি ও গোত্রের মাঝে আল্লাহ্ এর আগে নবী পাঠিয়েছেন এবং যাদের সামনে হেদায়েতের আলোস্বরূপ 'কিতাব' নাযিল করেছেন, ইসলামে ঐসব নবী ও কিতাবের উপর ঈমান আনা ফরয। এজন্যই হযরত ঈসা (আ)-এর উপরও প্রতিটি মুসলমান ঈমান রাখে।

যে সব জাতির প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, কুরআন মজীদে তাদেরকে বলা হয়েছে 'আহলে কিতাব'। ঈসা (আ)-র অনুসারীরাও এই আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং ঈসা (আ)ও সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী হযরত মুহামদ (সা)-এর উম্মত হবেন আখেরী জামানায়। কিন্তু তাঁর অনুসারী বলে দাবিদাররাই নানারূপ ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে মানব জাতির নেতা রহমাতুল্লিল আলামীনকে অস্বীকার করলো। নবীজির বিরুদ্ধে দুশমনি করলো। যুদ্ধ করলো। ইহুদীদের সাথে মিলে চক্রান্ত পাকালো।

অথচ খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিলেও শেষ নবীর আগমনের কথা রয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত মহানবী (সা) যখন ধরায় এলেন, তখন খৃস্টানরা বিভ্রান্ত হয়ে তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করলো। বিভ্রান্তি ও গোমরাহীই মানব জাতির দুঃখ-দুর্গতির মূল কারণ।

ঈসা (আ)-এর উপর ইঞ্জিল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল। তাকে মানব জাতির সর্বকালীন জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলাই নির্বাচন করেন নি। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সমসাময়িক জাতির নৈতিক পদস্খলনকে সংস্কার করে তাদেরকে এক আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের প্রতি সমর্পণ করার তাগিদ ছিল ঐ কিতাবে। কিন্তু মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধান তাতে ছিল না। ইসলামই হচ্ছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা, যাতে মানব জীবনের সামগ্রিক সমস্যাবলীর নিখুঁত সমাধান রয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বকাল পর্যন্ত যত নবী এসেছেন এবং যত আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে তা ইসলামের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যেরই অংশ। মানব জাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে বিভিন্ন হেদায়েতসহ নবীদের পাঠিয়েছেন। সকল ক্ষেত্রেই নবীদের মূল শিক্ষা ছিল, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন 'ইলাহ' কে ইবাদত করা চলবে না। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে না। আইনদাতা হিসেবেও শুধু আল্লাহ্কেই মানতে হবে। আর সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। সৎভাবে জীবন-যাপন করতে হবে। শয়তানরূপ নফ্স বা প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি মত চললে সে নাজাত পাবে না। বরং তাকে কিয়ামতে কঠিন আজাব ভোগ করতে হবে। আর মানুষকে কখনও মানুষের বিধানদাতার মর্যাদায় বসানো যাবে না। সকল নবীই মানব জাতির সামনে এই শিক্ষাই পেশ করেছেন। নবীদের এই ধারাবাহিক শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করেছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) -এর মারফত। স্বভাবতই 'আহলে কিতাবদের' কর্তব্য ছিল বিশ্ব নবী (সা)-র উপর ঈমান আনা। আল্লাহ্ তাঁর কিতাব ও নবীদের উপর যদি তাঁদের ঈমান থাকত, তাহলে তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারত না। কিন্তু খৃষ্টানদের মধ্যে গোমরাহীর কলংক বাসা বেঁধেছিল। মুখে মুখে তারা 'আহলে কিতাবী' দাবি করলেও কাজকর্মে তারা ছিল বিভ্রান্ত ও অভিশপ্ত মুনাফিক।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক নবীজি সম্পর্কে বলছেন ঃ

"এবং আমরা তোমাকে' বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে ছাড়া পাঠাই নাই।"

আল্লাহ্ যুগে যুগে অনেক নবী পাঠিয়েছেন সত্য, কিন্তু কোন নবীকেই 'আল্লাহ্র রসূল'রূপে সম্বোধন করেন নি।

ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "এবং তিনি (আল্লাহ্) তাঁহাকে (ঈসাকে) ইসরাইল বংশীয়দিগের জন্য পয়গম্বর করবেন।"

হযরত মুহম্মদ (সা) -কে 'বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে' পাঠিয়েছেন। কিন্তু এই বিশ্বনবীকেও খৃষ্টানরা অবজ্ঞা করতে ছাড়েনি।

www.pathagar.com

তবে রোম সম্রাটের পিছু হটার ফলে অনেক খৃস্টানগোত্রই পবিত্র ইসলামের ছায়াতলে ঠাঁই নেয়। এই সময় নজরান প্রদেশের আরব খৃস্টানগণ হযরতের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। হযরত (সা) প্রথমে মুগীরা নামক একজন মুসলিম প্রতিনিধিকে নজরানের খৃস্টানদের কাছে ইসলামের দাওয়াতসহ পাঠান। কিন্তু তাঁকে নজরানের খৃস্টান অধিবাসীরা পাত্তা দেয়নি। এরপর নবীজি একটি পত্রসহ অপর একজন দূতকে সেখানে পাঠালেন।

নবীজির পত্র পেয়ে নজরানের খৃস্টানদের বিশপ কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি অনেক ভেবেচিন্তে ৬০ জন পাদ্রীর একটি প্রতিনিধিদলকে মদীনায় পাঠিয়ে দেন।

আসরের নামাযের পর খৃস্টান প্রতিনিধি দলটি মদীনার মসজিদে নববীতে এসে উপস্থিত হন। তাঁদেরকে মসজিদেই ঠাঁই করে দেয়া হলো। এই অনুপম উদারতার কোন তুলনা আছে কি?

এদিকে ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলো। খৃস্টানদের সন্ধ্য উপাসনার সময় এসে গেল। তারা একটি মোক্ষম সুযোগ পেল। মুসলমানদের মাগরিবের নামাযের সময়ও উপস্থিত। এই সময়ে তারা তাদের প্রার্থনার সুযোগ দাবি করলো। ব্যাপারটা একটু কঠিনই বটে। একই মসজিদে খৃস্টানরাও প্রার্থনা করবে, আবার মুসলমানরাও নামায পড়বে, এটা কেমন কথা! খৃস্টান পাদ্রীরা জেনেশুনেই মহানবী (সা)-র ঔদার্য ও পরমতসহিষ্ণুতা পরীক্ষা করার জন্য এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সাহাবীদের অনেকেই খৃস্টান পাদ্রীদের এ ধরনের প্রস্তাবে রুষ্ট ও বিব্রত হলেন। কিন্তু উদারতার মূর্ত প্রতীক নবী করীম (সা) খৃস্টান পাদ্রীদেরকে মসজিদে নববীতেই তাদের আরাধনা করার অনুমতি দিলেন। আর মুসলমানরা কাবা শরীফের দিকে মুখ করে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

খৃস্টান পাদ্রীগণ এই মহানুভবতায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। তবু তাঁরা ইসলাম গ্রহণে সম্মত হলেন না। মুক্তির আলোকরেখা তাদের দৃষ্টি সীমায় উদ্ভাসিত হয়ে আবার যেন অন্ধকারে হারিয়ে গেল। তারা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হলেন। খৃস্টানরা কি পরিমাণ কর দেবে এবং অন্য

www.pathagar.com

কি কি শর্ত তাদের মানতে হবে, তা নির্ধারণের জন্য হযরত (সা)-এর কাছে অনুরোধ করলেন।

হযরত (সা) তখন তাঁদেরকে একটি সনদ দিলেন। তাতে তাদের ধর্ম-কর্ম ও জানমাল হেফাজতের অঙ্গীকার করা হলো। যে পর্যন্ত তারা 'শান্তি ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করে চলবে, সে পর্যন্ত এই সনদের শর্ত সমভাবে বলবৎ থাকবে' বলে ঘোষণা করা হয়।

খৃস্টানগণ এই সনদপত্রসহ নজরানে ফিরে গেলেন। তারা স্বজাতির কাছে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। সবকিছু শুনে এবং হযরতের মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে বিশপের একজন ভাই প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেনঃ "ইনিই সেই প্রতিশ্রুত মহানবী, আমি তাঁর কাছেই চললাম।" তিনি সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে মদীনায় এসে নবীজির হাতে বাইয়াত হলেন। নজরানের আর একজন খৃস্টান সাধুও ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে নজরানে ক্রমে ইসলামের আলো বিকশিত হয়।

বিদায় হজ্জের অমর বাণী

নবীজির কাজ দিন দিনই পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। দিকে দিকে আল্লাহ্‌র বাণী ছড়িয়ে পড়ছিল। মদীনায় যে একটি ছোট দল প্রথমে সত্যের আহবান নিয়ে জীবন বাজী রেখে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই ছোট্ট দলটি এখন অনেক বড়। মর্যাদাও তাঁদের বহুগুণে বেড়ে গেছে। বিশেষ করে তাবুক অভিযানে মুসলমানদের কাছে রোমানদের পশ্চাদাপসরণের ফলে আরব জগৎ ও সমসাময়িক জগতে মুসলমানদের মুকাবিলা করার আর কেউ রইল না।

এদিকে দশম হিজরীর পুরো সময়টাই মহানবী (সা) প্রচারে কাটালেন। সত্য বিস্মৃত, গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত মানব সমাজকে তিনি আলোর সন্ধান দেবার জন্য ছিলেন সদাব্যস্ত। দিকে দিকে ইসলামের পয়গাম নিয়ে তিনি বিভিন্ন প্রচারকারী দল পাঠালেন। ইতিমধ্যে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত দীন জীবনব্যবস্থা। ইসলামের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার শক্তি কারো নেই। আর তাই ইসলামে নব-দীক্ষিত গোত্রের সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

www.pathagar.com

অনুগত দেশ ও গোত্রগুলোর কাছ থেকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নেবার সাথে সাথে কর আদায়েরও ব্যবস্থা করা হয়।

দশম হিজরী নবীজির জীবনের একটি দুর্ঘটনার বছর। হযরতের একমাত্র পুত্র। নাম তাঁর ইবরাহীম। বয়স মাত্র সতেরো বা আঠারো বছর। এই বছরই তাঁর সেই স্নেহের সন্তানটিকে আল্লাহ্ কেড়ে নিলেন। পুত্র বিয়োগে নবীজি অন্তরে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। নীরবে তিনি অশ্রু বিসর্জন করে ব্যথার ভার লাঘব করলেন। নবীদেরকে আল্লাহ্ নানাভাবে পরীক্ষা করেন। আমাদের নবীজিও যে একজন মানুষ এবং অন্যান্য মানুষের মতই সুখ-দুঃখের অংশীদার এই দুর্ঘটনা দিয়ে আল্লাহ্ হয়ত সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন।

ইবরাহীমের মৃত্যুর দিনেই ছিল সূর্যগ্রহণ। অনেকে ভক্তির আতিশয্যে প্রচার করে বেড়াতে লাগলো যে, হযরতের পুত্রের মৃত্যুর কারণেই প্রকৃতির এই রূপান্তর হয়েছে। ব্যাপারটি নবীজির কাছে পৌঁছলো। তিনি সাথে সাথে লোকদের ডেকে এনে পরিষ্কার ভাষায় এই ভুল ধারণা ভেংগে দিলেন।

তিনি বললেন ঃ 'আমার পুত্রের মৃত্যুর সাথে সূর্যগ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্র অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে সূর্যগ্রহণ একটি নিদর্শনমাত্র। আর গ্রহণের সময় তোমরা আল্লাহ্র অসীম কুদরতের কথা চিন্তা করে মুনাজাত করবে।'

এভাবেই নবীজি লোকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করে দিলেন। সীমিত জ্ঞানের মানুষ নবীজির চরিত্রে একটি অতি মানবীয় প্রলেপ দিতে চাইলেও নবীজি তা প্রত্যাখ্যান করলেন দৃঢ়ভাবে।

দেখতে দেখতে দশম হিজরীও কেটে গেল। আবার হজ্জের সময় এসে পড়ল। হযরত এবার হজ্জে যাবার মনস্থ করলেন। আগেভাগেই তিনি তাঁর এই অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন। এবার অনেকেই নবী (সা)-এর সাথে হজ্জের সফর সঙ্গী হবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। সমগ্র মদীনা জুড়ে মুসলমানদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো। মদীনার ঘরে ঘরে হজ্জে যাবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

এবার নবীজি তাঁর প্রিয়তমা বিবিদেরও সাথে নিয়ে চললেন। এটাই ছিল নবীজির জীবনের সর্বশেষ হজ্জ।

www.pathagar.com

সময় গড়িয়ে গেল। যিলকদ মাসের পঁচিশ তারিখ এসে গেল। নবীজি তাঁর প্রিয় সাহাবাদের নিয়ে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। পথে অনেক মুসলমান মহানবী (সা)-এর সঙ্গ নিলেন। এমনিভাবে দু'লক্ষ মুসলমানের এক বিশাল কাফিলা নিয়ে নবীজি যিলহজ্জ মাসের পাঁচ তারিখ মক্কায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

পবিত্র মক্কা নগরীর প্রবেশ পথেই নবীজির দৃষ্টিতে ভেসে উঠল আল্লাহ্‌র ঘর কাবা শরীফ। হযরত সাথে সাথে সাহাবাদের নিয়ে দু'হাত তুলে পরওয়ারদিগারের কাছে মুনাজাত করলেন ঃ 'ইয়া আল্লাহ! এই গৃহকে চিরকল্যাণ ও চিরমহিমায় ভাস্বর কর এবং যারাই এখানে হজ্জ করতে আসবে, তাদের সুখ-শান্তি ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি কর।'

হযরত অতপর সাহাবীদের বিশাল কাফিলা নিয়ে কাবাগৃহে উপস্থিত হলেন এবং সাতবার কাবাঘর তাওয়াফ করলেন।

ইতিমধ্যে হজ্জের পবিত্র দিনটি এসে উপস্থিত হলো। লাখো লাখো মুসলমানের 'লাব্বায়েক' ধ্বনিতে কাবা প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠল। সকলেই উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ প্রভু হে! আমরা তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে তোমারই কাছে নাজাত প্রার্থী।'

হযরত (সা) এরপর মুসলমানদের বিশাল কাফিলা নিয়ে আরাফাতের দিকে ছুটে চললেন। সেখানে তিনি সমবেত জনতার সম্মুখে ভাষণ দান করলেন। ইতিহাসে এই ভাষণটিই বিদায় হজ্জের ভাষণ হিসেবে সুপরিচিত। কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত নবীজি (সা)-র এই মহামূল্যবান ভাষণ পথহারা বনি আদমকে পথ দেখাবে।

সে অমর বাণীতে তিনি বিশ্বমানবের জন্য পথ নির্দেশ রেখে গেছেন। তিনি সমবেত ভক্তবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় বললেন ঃ

"হে আমার প্রিয় সাথী বৃন্দ! আজ যে কথা তোমাদেরকে বলব, মনোযোগ দিয়ে তোমরা তা শুনবে। আমার আশংকা হচ্ছে, তোমাদের সাথে একত্রে হজ্জ করার সুযোগ আর আমার ঘটবে না। হে মুসলমানগণ! জাহেলী যুগের সমস্ত ধ্যান-ধারণা ভুলে যাও, নব আলোকে পথ চলতে শিখ। আজ হতে অতীতের সমস্ত মিথ্যা সংস্কার, অনাচার ও পাপ-প্রথা বাতিল হয়ে গেল।

www.pathagar.com

মনে রেখো, সব মুসলমান ভাই ভাই। কেউ কোরো চেয়ে ছোট নও, কারও চেয়ে বড়ও নও। আল্লাহ্‌র চোখে সকলেই সমান। নারী জাতির কথা ভুলো না। নারীর উপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, তেমনি পুরুষের উপর নারীরও তেমনি অধিকার আছে। তাদের প্রতি অত্যাচার করো না। মনে রেখো আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণকে গ্রহণ করেছ।

সাবধান! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না। এই বাড়াবাড়ির ফলেই অতীতে বহুজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

প্রত্যেক মুসলমানের জানমাল পবিত্র বলে জানবে। যেমন পবিত্র আজকের এই দিন— ঠিক তেমনি পবিত্র তোমাদের পরস্পরের জীবন ও ধন-সম্পদ।

হে মুসলমানগণ! সাবধান, নেতার আদেশ কখনও অমান্য করো না। যদি কোন নাক কাটা হাবশী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর করে দেওয়া হয় এবং সে যদি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে তোমাদেরকে চালনা করে, তবে অবনত মস্তকে তার আদেশ মেনে চলবে। দাসদাসীদের প্রতি সর্বদা সদয় ব্যবহার করবে। তাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করো না। তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তাই খাওয়াবে। যা পরবে, তা-ই তাদেরকেও পরাবে। ভুলো না যে, তারাও তোমাদের মতই মানুষ।

সাবধান! পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদেরকে স্পর্শ না করে। শিরক করো না। চুরি করো না। মিথ্যা কথা বলো না। ব্যভিচার করো না। সকল প্রকার মলিনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে পবিত্র জীবন-যাপন করবে। চিরদিন সত্যাশ্রয়ী থাকবে।

মনে রেখো, একদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। সেদিন তোমাদের কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। বংশের গৌরব করো না। যে ব্যক্তি নিজ বংশকে হেয় মনে করে অপর কোন বংশের নামে আত্মপরিচয় দেয়, আল্লাহ্‌র অভিশাপ তার উপর নেমে আসে।

হে আমার উম্মতগণ! আমি যা রেখে যাচ্ছি, তা যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক, তবে কিছুতেই তোমাদের পতন হবে না। সেই গচ্ছিত সম্পদ কি ? তা আল্লাহ্‌র কুরআন ও তাঁর রাসূলের জীবন ও কর্মকাণ্ড।

www.pathagar.com

নিশ্চয় জানিও, আমার পরে আর কেউই নবী নেই। আমিই শেষ নবী। যারা উপস্থিত আছ, তারা অনুপস্থিত সকল মুসলমানের নিকট আমার এ সকল বাণী পৌঁছে দিও।"

হযরতের মুখমন্ডল ক্রমেই বেহেশতি নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল। তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমেই করুণ ও ভাব-গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল।

ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে মুখ তুলে তিনি আবেগময় ভাষায় বলতে লাগলেন ঃ

"হে আল্লাহ্, হে আমার প্রভু! আমি কি তোমার বাণী পৌঁছে দিতে পেরেছি? আমি কি আমার কর্তব্য সম্পাদন করতে পেরেছি ?"

সমবেত লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হলো ঃ "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

হযরত তখন বলতে লাগলেন ঃ "প্রভু হে, শোন সাক্ষী থাকো। এরা বলছে, আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি।" কিছুক্ষণ হযরতের মুখে কোন কথা শোনা গেল না। গভীর এক তন্ময়তায় তিনি বিভোর হয়ে গেলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে যে নূরের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, সে জ্যোতি ক্রমে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। ঠিক তখনই পবিত্র কুরআনের শেষ আয়াতটি নাযিল হলো।

" (হে মুহাম্মদ!) আজ আমি তোমাদের দীনকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমার উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকেই তোমাদের জীবন বিধানরূপে মনোনীত করলাম।" (৫ ঃ ৩)

হযরত কিছুক্ষণ আবার ধ্যানমৌন হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর করুণামাখা দৃষ্টি মেলে বিশাল জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন ঃ

বিদায়! বন্ধুগণ, বিদায় !

এই বিদায় সম্ভাষণ যেন সেদিনের আকাশ-বাতাসে অনুরণিত হয়ে ফিরতে লাগল।

ইফাবা—৯২-৯৩-প্র/৬১১০ (উ)—৫,২৫০

www.pathagar.com